বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

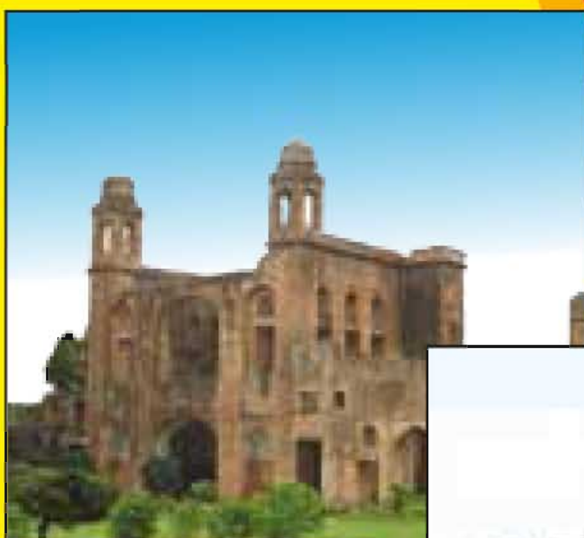

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনায়

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
ড. সেলিনা আক্তার
ফাহ্‌মিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সামাজিকবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৈশ্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। আশা করা যায় এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে লালিত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে তুলনা করে নিজের জানার জগতকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যাশিত জীবনদক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশের ইতিহাস	১— ১২
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ ও বিশ্বসভ্যতা	১৩— ১৯
তৃতীয়	বিশ্ব-ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ	২০— ৩১
চতুর্থ	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৩২— ৩৯
পঞ্চম	বাংলাদেশের সমাজ	৪০— ৪৭
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের সংস্কৃতি	৪৮— ৫৪
সপ্তম	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৫৫— ৬৫
অষ্টম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৬৬ — ৭৪
নবম	বাংলাদেশের পরিবেশ	৭৫ — ৮০
দশম	বাংলাদেশে শিশু অধিকার	৮১— ৮৫
একাদশ	বাংলাদেশে শিশুর বেড়ে উঠা ও প্রতিবন্ধকতা	৮৬— ৯৪
দ্বাদশ	বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	৯৫— ৯৯
ত্রয়োদশ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১০০— ১০৪

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের ইতিহাস

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের আজকের বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান আমলের পুরো সময়টিতে এদেশের মানুষ নানাভাবে বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাই অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। তারই ফসল আমাদের এই বাংলাদেশ। বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। জাতি অর্জন করেছে বিজয়। ইতিহাসে আমরা পরিচিত হয়েছি বীর বাঙালি ও বিজয়ী জাতি হিসাবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে মানব বসতির ধারা বর্ণনা করতে পারব;
- রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগ বিভাজন করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- আধুনিক যুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- দেশটির জন্মকথা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ববোধ করব।

পাঠ- ১ ও ২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। সে বছর ২৫শে মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। মার্চ থেকে ডিসেম্বর-এই নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা এদেশে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আর

বাঙালি ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এত বড় ঘটনা তো হঠাৎ করে শুরু হয় নি। স্বাভাবিকভাবে এরও একটি পটভূমি ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশটি ছিল দুইটি অংশে বিভক্ত-পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুইটি অংশের মধ্যে প্রায় বারো'শ মাইলের ব্যবধান। মাঝখানে অন্য একটি দেশ ভারত। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, ক্ষমতাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই হাতে। অনেক আন্দোলন, সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে অর্জিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানি অর্থাৎ বাঙালিদের উপর বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা শুরু করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানিরা প্রথম আক্রমণ করল বাঙালিদের সংস্কৃতি অর্থাৎ মাতৃভাষা বাংলার উপর। তারপর রাজনৈতিক অধিকারের উপর। একতরফা ক্ষমতা ভোগ করে পাকিস্তানি শাসকরা আঘাত হানল আমাদের অর্থনীতির উপর। পাশাপাশি চলল বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা আর তা ধ্বংসের প্রয়াস। এ অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু করে। এ

সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এক সাহসী, ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। উজ্জীবিত জাতি ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু সামরিক সরকার এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন এ দেশের রাজনীতিবিদ, ছাত্র-জনতাসহ আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপসহীন অবস্থান নেয়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও আমাদের বিজয়

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ গভীর রাতে ভারী অস্ত্র আর ট্যাংকবহর নিয়ে এ দেশের ঘুমন্ত মানুষের উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি বার্তা সারা দেশে পাঠিয়ে দেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। তখন বাঙালি পুলিশ, ইপিআর সদস্য, সেনা ও জনতা দ্রুত সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এদেশের পুলিশ-ইপিআর সদস্য-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক দেশ এই দুঃসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এক কোটিরও বেশি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন। অসংখ্য ঘরবাড়ি, জনপদ, লোকালয়, গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অনেক রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি। এ দিনটি আমরা বিজয়দিবস হিসাবে পালন করি। সেদিন তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

২৫শে মার্চ কালরাত্রির গণহত্যা

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করল। তাই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের স্থপতি।

স্বাধীনতার একদিকে রয়েছে অনেক হারানোর বেদনা, অন্যদিকে বিশাল প্রাপ্তির আনন্দ। রক্তেভেজা স্বাধীনতার লালসূর্য আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলসুন্দর দেশের উপর।

কাজ-১ : মুক্তিযুদ্ধের কারণগুলো শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-২ : মুক্তিযুদ্ধে কেন আমরা বিজয়ী হয়েছি তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-৩ : মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি কর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে যে দেশের জন্ম হলো তার ইতিহাস কিন্তু অনেক প্রাচীন এবং এর পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলাদেশের মানব বসতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার উত্থান-পতন ও ফলাফল সম্পর্কে জানব।

পাঠ- ৩, ৪ ও ৫ : বাংলাদেশে মানব বসতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে মানব বসতি ছিল। বর্তমান কালের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে তা প্রমাণ হয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার কোনো কোনো অঞ্চল বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূমি। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলার কিছু অঞ্চলও বেশ প্রাচীন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, সীতাকুণ্ড, কুমিল্লার লালমাই, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার যেমন- পাথর ও কাঠের হাতকুঠার, বাটালি, তীরের ফলক প্রভৃতি আবিষ্কার হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগকেই অনেকে প্রস্তর যুগ বলে। প্রস্তর যুগের মানুষ বনে-বাদাড়ে ঘুরে যাযাবরের মতো জীবনযাপন করেছে। পশু-পাখি ও মৎস্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে।

প্রস্তর যুগের পর নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে তাম্র-প্রস্তর যুগের গর্ত-বসতির চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় প্রস্তর যুগ ও তাম্র-প্রস্তর যুগের মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্তমান পাকিস্তানের হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও ভারতের লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি প্রত্নস্থানে সিন্ধু (হরপ্পা) নগর সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০-১৭০০ অব্দ) ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা।

ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার কোনো চিহ্ন বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি। তবে ভারত উপমহাদেশের দ্বিতীয় নগর সভ্যতার নিদর্শন বগুড়ার বরেন্দ্র ভূমি মহাস্থানগড়ে এবং নরসিংদীর মধুপুর ভূমি উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কার হয়েছে। মহাস্থানগড়ে অবস্থিত প্রাচীন নগরটির নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল। উয়ারী-বটেশ্বরে অবস্থিত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন নগরটির নাম এখনও জানা যায় নি। সমসাময়িক কালে ভারত উপমহাদেশের ১৬টি বিখ্যাত জনপদের নাম জানা যায়। এই জনপদগুলো ছিল এক একটি পৃথক রাষ্ট্র। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদগুলোর মৌর্য যুগ-পূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস অল্পবিস্তর জানা যায়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অংশের ইতিহাস মৌর্য যুগের সম্রাট অশোকের সময় থেকে জানা যায়। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমান করা হয় মৌর্য সম্রাট অশোক পুণ্ড্রনগর শাসন করেছেন।

২০২০

আবার কেউ কেউ বলেছেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত মৌর্য শাসনাধীন ছিল। মৌর্য যুগের পর ভারত উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলে শুঙ্গ ও কুষাণ রাজাদের শাসন ছিল। বাংলাদেশ অঞ্চলে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের কিছু পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু শাসন বিস্তারের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

আমাদের দেশের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় গুপ্ত যুগ থেকে। গুপ্তরা মূলত ভারত উপমহাদেশের উত্তর অঞ্চলের শাসক ছিলেন। বাংলাদেশের উত্তরাংশে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামে একটি প্রদেশ গুপ্তদের শাসনাভুক্ত ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের বাংলাদেশ প্রাচীনকালে একক কোনো দেশ ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল তখন পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, বরেন্দ্র, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ নামে পরিচিত ছিল।

গুপ্ত শাসনের শেষের দিকে বাংলাদেশ অঞ্চলের আরও কিছু রাজার নাম পাওয়া যায়, যারা 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত। পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের পর সপ্তম শতকে শশাঙ্ক নামে এক শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গৌড়ের শাসক ছিলেন। তাঁকে গৌড়ের প্রথম স্বাধীন শাসক বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর প্রাচীন বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী শাসকের তথ্য পাওয়া যায় না। স্থায়ী শাসকের অভাবে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে। ছোট রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

পাল রাজবংশ (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল রাজবংশ বাংলাদেশের প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল শতবর্ষ ব্যাপী কলহ, নৈরাজ্য ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে বরেন্দ্র (গৌড়)-এর সিংহাসনে বসেন। কথিত আছে যে, প্রজাদের প্রতিনিধি বা কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা গোপালকে নির্বাচন করে। অপর একটি মত আছে যে, সামন্তরা গোপালকে ক্ষমতায় বসায়। গোপাল যোগ্য শাসকের পরিচয় দেন। ধর্মপাল, দেবপালও এ বংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন। পালবংশের দীর্ঘ শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প ও শিল্পকলাসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে।

কৈবর্ত বিদ্রোহ

দীর্ঘ ৪০০ বছরের পাল শাসকদের অনেকেই দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শাসন পরিচালনা করলেও কেউ কেউ তা পারে নি। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল-এর সময় রাজ্যে এক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃ কলহে লিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মহীপাল দুর্বল হয়ে পড়েন। ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দে দিব্য-এর নেতৃত্বে কৈবর্ত নামে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ সফল বিদ্রোহ করে মহীপালকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করে। কিন্তু কৈবর্তদের রাজত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী। মহীপালের ভাই রামপাল সামন্তদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কৈবর্ত শাসক ভীমকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে ১০৮২ খ্রিষ্টাব্দে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পাল শাসকদের সমসাময়িক সমতট (প্রধানত কুমিল্লা ও বিক্রমপুর) জনপদে খড়্গ, দেব, চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। সপ্তম শতকে চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট পরিভ্রমণ করে ৩০টি বৌদ্ধবিহার দেখতে পান। সমতটের বজ্রযোগিনীর সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি একাদশ শতকে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সেদেশে যান বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় রোধের জন্য।

সেন রাজবংশ (১০৯৮-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

সেনরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে পালদের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য এদেশে এসেছিল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে থাকে। শেষ দুর্বল পাল রাজা মদনপালের রাজত্বকালে বিজয় সেন ক্ষমতায় আসেন। বিজয় সেনের পরে রাজা ছিলেন বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন। বলা হয়ে থাকে সেনরা প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন শাসন পরিচালনা করেন। সেনদের মধ্যে বিজয় সেন এবং বল্লাল সেন শৈব সম্প্রদায়ের ছিলেন। লক্ষণ সেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরাগী ছিলেন। সেনরা ধর্ম-কর্মের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। লক্ষণ সেনের কাছ থেকে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয় করেন। তবে লক্ষণ সেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন আরও কিছু সময় (১২০৫-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বিক্রমপুরে থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ শাসন করেন। বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে।

মৌর্য আমল থেকে সেন আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীনযুগ বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

কাজ- ১ : প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থানগুলো ও প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত উপকরণগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ২ : কালানুসারী ভারত উপমহাদেশের সভ্যতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ৩ : কালানুসারী প্রাচীন রাজবংশগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। সীমিত সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়জীবন সম্পর্কে জানব।

পাঠ- ৬ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম

কৃষি : প্রাচীনযুগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। এ সময় কৃষিতে উদ্বৃত্ত ছিল। ধান ছিল প্রধান ফসল। প্রচুর আখও উৎপাদন হতো। আখ থেকে উৎপাদিত গুড় ও চিনির খ্যাতি ছিল। এই গুড় ও চিনি বিদেশে রপ্তানি হতো। তুলা, সরিষা ও পান চাষের জন্যও বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল। নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, ডুমুর প্রভৃতি ফলের কথাও জানা যায়।

কুটিরশিল্প : প্রাচীনযুগ থেকেই বাংলাদেশের তাঁতিরা মিহি সুতি ও রেশমি কাপড় বুনতে পারদর্শী ছিল। আমরা জানি বাংলাদেশের মসলিন কাপড় পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। এই মসলিন তখনও রপ্তানি হতো। এ ছাড়াও তখন উন্নতমানের মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র ও অলংকার নির্মাণ হতো। পোড়ামাটি, ধাতব ও পাথরের ভাস্কর্য ও মূর্তি ছিল প্রশংসনীয় শিল্প। ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতিও তৈরি হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : কৃষিতে উদ্বৃত্ত হওয়ায় এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল হাট-বাজার ও গঞ্জ। ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথেই হতো বেশি। উয়ারী-বটেশ্বর ও পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) ছিল সমৃদ্ধ নদীবন্দর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যেত তৎকালীন বাংলাদেশের পণ্য। অষ্টম শতকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে এদেশের পণ্য আরবে যেত।

ধর্মমত ও সম্প্রদায় : অনুমিত হয় প্রস্তর যুগে বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির পূজা করত। ঐতিহাসিক যুগে ভারত উপমহাদেশের মতো বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আজীবক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে জৈন ধর্মও প্রচলিত ছিল। তবে দীর্ঘসময় বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। পাল সম্রাটগণ ছিল বৌদ্ধ কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের। সম্রাট ধর্মপাল ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজকীয় উচ্চ পদসমূহে অধিষ্ঠিত দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যদের। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পরিবার তিন পুরুষ ধরে পাল শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল। তৎকালীন একাধিক তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ্য মন্দির নির্মাণে ভূমিদানের কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। ধর্মীয় সম্প্রীতি পাল যুগের সমাজজীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। আজও বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান দেখা যায়।

কাজ - ১ : বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের ধর্মমতের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৭ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : বিনোদন সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

বিনোদন সংস্কৃতি : প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে বিনোদন ও ধর্মকর্মের অংশ হিসাবে নাচ, গান, নাটক, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলার প্রচলন ছিল। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরের সেবাদাসীদের সকলকেই নৃত্য-গীত-বাদ্য পটিয়সী হতে হতো। পোড়ামাটির ফলকে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়।

স্থাপত্য : উয়ারী-বটেশ্বর ও পুণ্ড্রনগরে ইট-নির্মিত স্থাপত্য আবিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশ স্থাপত্যশিল্পে উৎকর্ষ অর্জন করে পাল শাসনামলে। কথিত আছে, সম্রাট ধর্মপাল একাই ৫০টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। অষ্টম- নবম শতকে নির্মিত তাঁর অমর স্থাপত্যকীর্তি নওগাঁ জেলার সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার)। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার সোমপুর মহাবিহার ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমারে সোমপুর মহাবিহারের পরিকল্পনা অনুকরণ করে বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। ময়নামতির শালবন বিহার এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিক্রমপুরের স্থাপত্যসমূহ বাংলাদেশের স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

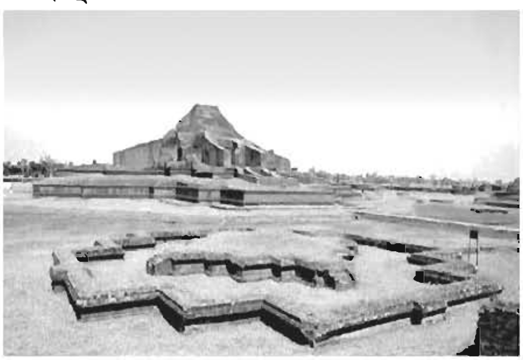

সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ

শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

২০২০

ভাস্কর্য ও মূর্তি শিল্প : উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি, পাথর ও ধাতব ভাস্কর্য ও মূর্তি শিল্প উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় পাল যুগে ভাস্কর্য শিল্প এক নতুন রূপ লাভ করে, যাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'পাল স্কুল অব স্কাল্পচারাল আর্ট' নামে। বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্প স্থান করে নিয়েছিল সর্বভারতীয় শিল্পকলার আসরে। পাল যুগের দুই বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ধীমানপাল ও বীটপাল সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেনযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।

চিত্রশিল্প : বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবীর রূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। এখন পর্যন্ত দশম থেকে দ্বাদশ শতকের চব্বিশটি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্টসাহস্রিকা প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলো গুণগত মানে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতকে নেপাল ও তিব্বতের চিত্রকলায় পাল যুগের চিত্রশিল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি ও কাচের পুঁতিতে চিত্রশিল্পের ব্যবহার দেখা গেছে।

কাজ - ১ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্যের তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ২ : প্রাচীন বাংলাদেশের বিনোদনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৮ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা

ভাষা ও সাহিত্য : মহাস্থানগড়ে (পুণ্ড্রনগর) পাথরে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা লিপিটির সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। পাল ও সেন যুগের শাসকরা নিজেরাও পণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্য চর্চা করতেন। তাদের সভাকবিও ছিল।

পালযুগের তাম্রশাসনে বিধৃত 'প্রশস্তি' অংশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার শৈল্পিক মানসম্পন্ন কাব্য রচনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' পাল যুগের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। পাল আমলে রচনা করা হয় চর্যাপদ। চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত।

সেন রাজাগণ রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নিজেরাও বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য রচনা করতেন। পণ্ডিতদের সাহিত্য রচনায়ও উদ্বুদ্ধ করতেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' রাজা বল্লাল সেনের রচনা। লক্ষণ সেন পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পিতা বল্লাল সেনের অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' তিনি সমাপ্ত করেন। সেনদের রাজসভায় পণ্ডিত, জ্ঞানী ও কবিদের সমাবেশ ঘটেছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কবীন্দ্র ধোয়ারির 'পবনদূত' কাব্য অমর সাহিত্যকর্ম। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা কবিতা সেন যুগের শেষ দিকে শ্রীধর দাস সংকলন করে নাম দেন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

শিক্ষা : পাল যুগের আগে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায় না। তবে পাল যুগে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেখে অনুমান করা যায় মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে পাল যুগের অনেক বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার হয়েছে। বিহারগুলো ছিল এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২০২০

বিশেষ করে বৌদ্ধ ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করত। এখানকার শিক্ষকদের বলা হতো আচার্য বা ভিক্ষু। আর শিক্ষার্থীদের বলা হতো শ্রমণ। বর্তমান যুগের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিহারেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তিন ধরনের। যেমন- গুরুগৃহ, চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা। রাজা, মন্ত্রী বা অভিজাত পরিবারের ছেলেরা গুরুগৃহে পড়ার সুযোগ পেতো। গুরু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বনের মধ্যে কুটির বানিয়ে থাকতেন। তাঁর কাছে রেখে আসা হতো ছাত্রদের। ছাত্ররা গুরুর বাড়িতেই থাকত এবং গুরুর কাছে পড়াশোনা করত। চতুষ্পাঠীতে পড়তে পারত কেবল ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখানো হতো, যাতে টোলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো টোল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ টোলের প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল।

বারো-তেরো শতকের মধ্যে ইউরোপের নানা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। যেমন- ইতালির বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। অথচ অষ্টম শতকের মধ্যেই বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল। এসব বিহারে শুধু ধর্মীয় বই পড়ানো হতো তা নয়-এখানে চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্রসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল।

কাজ - ১ : প্রাচীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করার কারণ দলগতভাবে যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন কর।
কাজ - ২ : পাল ও সেন যুগের সাহিত্যকর্মগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৯ : মধ্যযুগে বাংলাদেশ

মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে মধ্যযুগের সূচনা হয়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তুর্কি মুসলমান সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। এরপর তুর্কি মুসলমান সেনাপতিরা পুরো বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার করতে থাকেন। এর আগেই ভারতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লি ছিল তাদের রাজধানী। দিল্লির সুলতানদের পাঠানো সেনাপতিরা বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশ শাসন করতে থাকেন। জয় করা অংশে প্রশাসকের দায়িত্ব পান তারা। দিল্লি থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব অনেক। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। ধন-সম্পদে ভরা দেশটিতে দিল্লির সুলতানের অধীনে প্রশাসক হয়ে না থেকে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনার ইচ্ছায় শাসকেরা দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। এ খবর দিল্লিতে গেলে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সৈন্য পাঠানো হতো। এভাবে কখনো পরাজয়ের কখনো জয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একসময় পুরো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই স্বাধীনতা টিকে থাকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয়। তখন ভারত দখল করে নিয়েছিল আরেকটি মুসলমান শক্তি। তাঁরা মোগল নামে পরিচিত। এভাবে দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতে মোগল বংশের শাসন শুরু হয়। শুরু থেকেই বাংলাদেশকে দখলে রাখার চেষ্টা করেছে মোগলরা। তবে সফল হয় নি। আফগান বংশের মুসলমান শাসকরা কিছুকাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখেন। এ সময় বিহার

অঞ্চলে আফগানদের জমিদারি ছিল। আফগানদের বিখ্যাত নেতা শেরখান শূর মোগলদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন। এভাবে বাংলাদেশে স্বাধীন আফগান শাসন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবরও আমাদের এই বাংলাদেশ দখল করতে পারেন নি।

বাংলাদেশের বড় বড় জমিদারদের বলা হতো বারোভূঁইয়া। এই বারোভূঁইয়া একজোট হয়ে মোগলদের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মোগলদের অধীনে আসে। স্বাধীনতা হারিয়ে এবার বাংলাদেশ দিল্লির অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এদেশে পরোক্ষভাবে মোগল শাসন চলে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতানি থেকে মোগল পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসনকাল মধ্যযুগ নামে পরিচিত।

কাজ : মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের রাজবংশগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-১০ : আধুনিক যুগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই ভারত উপমহাদেশের অংশ। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসে ইংরেজরা। মোগল যুগ থেকেই ইউরোপের বণিক গোষ্ঠী এই উপমহাদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ইংরেজ বণিকরা এক সময়ে সুযোগ পেয়ে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন চলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর। প্রথম একশ বছর শাসন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামের বণিক প্রতিষ্ঠান। পরের একশ বছর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। রানির পক্ষ থেকে ইংরেজ শাসকরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করতেন। এই বিদেশি শাসনকে মেনে নিতে পারে নি বাংলাদেশের মানুষ। তাই তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এ সময় জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তান ছিল দুইটি ভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি বেমানান রাষ্ট্র। পশ্চিম অংশটিকে বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব অংশটিকে বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের হাতে। তারা নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ করত। তাই অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি একত্রিত হয়। সংগ্রাম করতে থাকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে। অবশেষে ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাঙালি অর্জন করে স্বাধীনতা। জন্ম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের।

কাজ : আধুনিক যুগে বাংলাদেশ কাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২০২০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন তারিখে বিজয়দিবস পালিত হয়?

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারি　　গ. ১৭ই এপ্রিল

খ. ২৬শে মার্চ　　ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর

২. প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কারণ কী?

ক. অত্যন্ত কর্মঠ জনগণ　　গ. অধিক উৎপাদনশীল কৃষি ও শিল্প

খ. উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা　　ঘ. অত্যাধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

তথ্য -১ :	নরসিংদীতে মাটি খনন করে পাথর ও কাঠের তৈরি হাত কুঠার, বাটালি, তীরের ফলা পাওয়া গেছে।
তথ্য -২ :	ঢাকার একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সভ্যতার নিদর্শন দেখার জন্য বগুড়া ও নরসিংদীতে শিক্ষা সফরে যায়।

৩. তথ্য -১ কোন যুগকে নির্দেশ করে?

ক. মধ্যযুগ　　গ. তাম্র প্রস্তর যুগ

খ. আধুনিক যুগ　　ঘ. প্রাগৈতিহাসিক যুগ

৪. তথ্য-১ ও ২ এর স্থানে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করবে-

i. পুণ্ড্রনগরের লিপি

ii. নানারকম প্রাচীন হাতিয়ার

iii. বিদেশে রপ্তানিকৃত শস্যভাণ্ডার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　গ. ii ও iii

খ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

তথ্য -১	তথ্য -২
প্রধান ফসল ধান। প্রচুর ধান উৎপাদন। রপ্তানিকৃত দ্রব্য চিংড়ি ও ব্যাঙ।	আকাশপথে আমেরিকায় তৈরি পোশাক রপ্তানি। পাটজাত দ্রব্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

২০২০

ক. কোন সম্রাট ৫০টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন?
খ. 'টোল' বলতে কী বোঝায়?
গ. তথ্য-১ এর মতো প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরবময় ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তথ্য-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ-মতামত দাও।

২. আধুনিক ইতালির জনক ছিলেন কাউন্ট ক্যাভুর। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাঁর দান ছিল সর্বাধিক। অন্যদিকে যোসেফ মাৎসিনি ইতালির যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করেন। যুব সমাজ অত্যাচার, অবিচার, কারাবাস প্রভৃতির ভয়ভীতি না করে দলে দলে তাঁর সংঘে যোগ দেয়। তাঁর নেতৃত্বে ইতালির জনগণের মধ্যে এক ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হয়।

ক. পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব কত মাইল?
খ. পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. কাউন্ট ক্যাভুরের মধ্যে কোন মহান নেতার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাৎসিনির মতো উক্ত নেতার নেতৃত্বের ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল-মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বিশ্বসভ্যতা

বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে জানতে হলে আমাদেরকে ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে জানতে হবে। ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতাকে প্রথম নগর সভ্যতা বলে। সিন্ধু সভ্যতা-মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সমসাময়িক। অপরপক্ষে, খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে শুরু হওয়া গঙ্গা অববাহিকার দ্বিতীয় নগর সভ্যতা ইউরোপের গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সমসাময়িক।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নগর সভ্যতা হিসাবে বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করতে পারব;
- নগর সভ্যতা হিসাবে পুণ্ড্রনগরের (মহাস্থানগড়) বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করতে পারব;
- এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের প্রাচীন নগর সভ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করব।

পাঠ -১: ভারত উপমহাদেশের নগর সভ্যতা

ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরানো সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা। এ সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু, সরস্বতী, হাকরা ইত্যাদি নদ-নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠে। এ সভ্যতার বড় দুইটি নগরের একটি হরপ্পা আর অন্যটি মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। সিন্ধু সভ্যতা ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা। উন্নত নগর পরিকল্পনা দেখা যায় সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোতে। নগরে রাস্তা, রাস্তার পাশে ডাস্টবিন, সড়ক বাতি, পানি নেমে যাওয়ার জন্য ড্রেন সব কিছুই ছিল একেবারে সাজানো। একতলা-দোতলা ঘরবাড়িগুলোও ছিল পরিকল্পিতভাবে তৈরি। প্রত্যেক বাড়িতে পানির জন্য ছিল কুয়া, ছোট ড্রেন দিয়ে বাড়ির ময়লা পানি চলে যেত রাস্তার বড় ড্রেনে।

মহেঞ্জোদারো নগরে আবিষ্কার হয়েছে এক বিশাল গোসলখানা। অনেকটা এখনকার সুইমিংপুলের মতো। হরপ্পাতে পাওয়া গেছে শস্য জমা রাখার জন্য বিশাল শস্যাগার। পোড়ামাটির বেশ কয়েকটি মূর্তিও পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। পাওয়া গেছে চুনা পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি। বিস্তৃত এই সভ্যতায় অসংখ্য সিল পাওয়া গেছে। সিলের গায়ে লিপির মতো চিহ্নগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই সভ্যতার পাথরের বাটখারা ও পুঁতিগুলো খুবই আকর্ষণীয়। সিন্ধু সভ্যতায় ছিল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ব্যবস্থা।

ভারত উপমহাদেশের এই সমৃদ্ধ সভ্যতাটি ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর আর পাওয়া যায় না। সিন্ধু সভ্যতা হারিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায় নি।

সিন্ধু সভ্যতার পর এক হাজার বছর ভারত উপমহাদেশের কোথাও কোনো নগর সভ্যতা গড়ে উঠে নি। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় আবার একটি নগর সভ্যতা বিকাশ লাভ করে; ভারত উপমহাদেশের এই সভ্যতাকে দ্বিতীয় নগর সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে পাটালিপুত্র, চন্দ্রকেতুগড়, চম্পা, বিদিশা, অমরাবতী ইত্যাদি নামে প্রায় ৪১টি

২০২০

প্রত্নস্থানে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বর এবং পুন্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) দ্বিতীয় নগর সভ্যতার নিদর্শন।

কাজ - ১ : দলে ভাগ হয়ে সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : যেসব প্রত্নস্থানে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ - ২ : উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার দুইটি গ্রামের বর্তমান নাম। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে আড়াই হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল সেই নগর সভ্যতার নগর কেন্দ্র। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠা নগর সভ্যতা একদিন ধ্বংস হয়; মাটির নিচে চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে জমি চাষ, গর্ত খনন প্রভৃতি গৃহস্থালি কাজে ভূমির মাটি ওলট-পালট হয়। প্রাচীন নিদর্শন ভূমির উপর চলে আসে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর ধাতব, কাচ ও পাথরের প্রত্নবস্তুগুলোও চকচকে দেখায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেগুলো সংগ্রহ করেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন। দীর্ঘদিন পর ২০০০ সাল থেকে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা শুরু হয়। প্রতি বছর উৎখননে পাওয়া গেছে অমূল্য প্রত্নবস্তু, সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত ধাতব অলংকার, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি, চুন-সুরকির রাস্তা, ইট নির্মিত স্থাপত্য, দুর্গ প্রভৃতি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে। ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা বাণিজ্যের পরিচায়ক। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল উয়ারী-বটেশ্বর। রোলেটেড মৃৎপাত্র ও স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতির আবিষ্কার উয়ারী-বটেশ্বরকে ভূমধ্যসাগর এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে। নবযুক্ত হাইটিন ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে উয়ারী-বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বলে।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন

উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কার হয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম চিত্রশিল্প। আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, পাথর ও কাচের পুঁতিতে এ চিত্রশিল্প ফুটে উঠেছে, যা উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কাজ : উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৩ : মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)

প্রায় ২৪০০ বছর আগে বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে উঠে মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)। নগরটি ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সেটি ছিল সুরক্ষিত। কালের পরিক্রমায় পুণ্ড্রনগর ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে টিপি ও জঙ্গলে পরিণত হয়। দেশপ্রেমিক ফকির মজনু শাহ মহাস্থানগড় জঙ্গল থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। মানুষ ভুলে যায় প্রাচীন নগরের আসল নাম। প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড়ে জরিপ করে অনুমান করেন এখানকার মাটির নিচে লুকিয়ে আছে বিখ্যাত পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। আবিষ্কার হতে থাকে নগরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, অলংকার, মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, লিপি প্রভৃতি। ৫-১০ মি. উঁচু দুর্গপ্রাচীর পরিবেষ্টিত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের নগরকেন্দ্রটি ছিল উত্তর-দক্ষিণে ১৫২৩মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৭১ মি.। অনুমিত হয় জনহিতৈষী মৌর্য শাসক সম্রাট অশোক পুণ্ড্রনগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ব্রাহ্মী লিপিতে পুণ্ড্রনগরে দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের শস্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এও বলা হয়েছে যে, সুদিন ফিরে আসলে প্রজাসাধারণ যেন আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা ফেরত দেন।

অন্যান্য দ্বিতীয় নগরসভ্যতার মতো পুণ্ড্রনগরও ছিল একটি সমৃদ্ধ নগর। পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী শহর। উল্লেখ্য, পুণ্ড্রনগরের সঙ্গে বাণিজ্যিক কারণে ভারত উপমহাদেশের অনেক নগর-বন্দরের যোগাযোগও ছিল। ফলে বহু বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনও ঘটেছিল। উর্বর ভূমি ও করতোয়া নদীর মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে পুণ্ড্রনগর এলাকায় ঘনবসতি ছিল।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

সপ্তম শতকে চীন দেশের পরিব্রাজক ও ধর্মযাজক হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রনগর এলাকায় ২০টি বৌদ্ধবিহার এবং ১০০টি ব্রাহ্মণ্য মন্দির দেখেছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলোকে আধুনিককালের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মহাস্থানগড় দুর্গনগর থেকে প্রায় ৬কি.মি. দূরে বিহার ইউনিয়নে ভাসু বিহার এবং তোতারাম পণ্ডিতের ভিটায় দুইটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হয়েছে। মহাস্থানগড় দুর্গনগর সংলগ্ন গোবিন্দ ভিটায় এবং ২কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে গোকুল মেধে দুইটি মন্দির আবিষ্কার হয়েছে।

২০২০

কাজ : মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৪ ও ৫ : প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা

অধিকাংশ প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠেছিল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে। এ পাঠে আমরা ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ব্যতীত বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানব।

মিশরীয় সভ্যতা : আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মিশরের নীল নদের তীরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেসময় মিশরের রাজাদের বলা হতো ফারাও। দেশবাসী ফারাওকে খুব শ্রদ্ধা করত। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর নতুন জগতেও ফারাওরা আবার তাদের রাজা হবেন। এ কারণে মিশরীয়রা যত্ন করে ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে গিয়েই মিশরের বিজ্ঞানীরা মমি তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন। আর মৃত দেহ যত্ন করে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তৈরি করা শেখে বিশাল পিরামিড। পাথর এবং ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরিতেও মিশরীয়রা দক্ষ ছিল। ছবির মতো দেখতে এক ধরনের লিপির উদ্ভাবন করতে পেরেছিল মিশরীয়রা।একে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি।

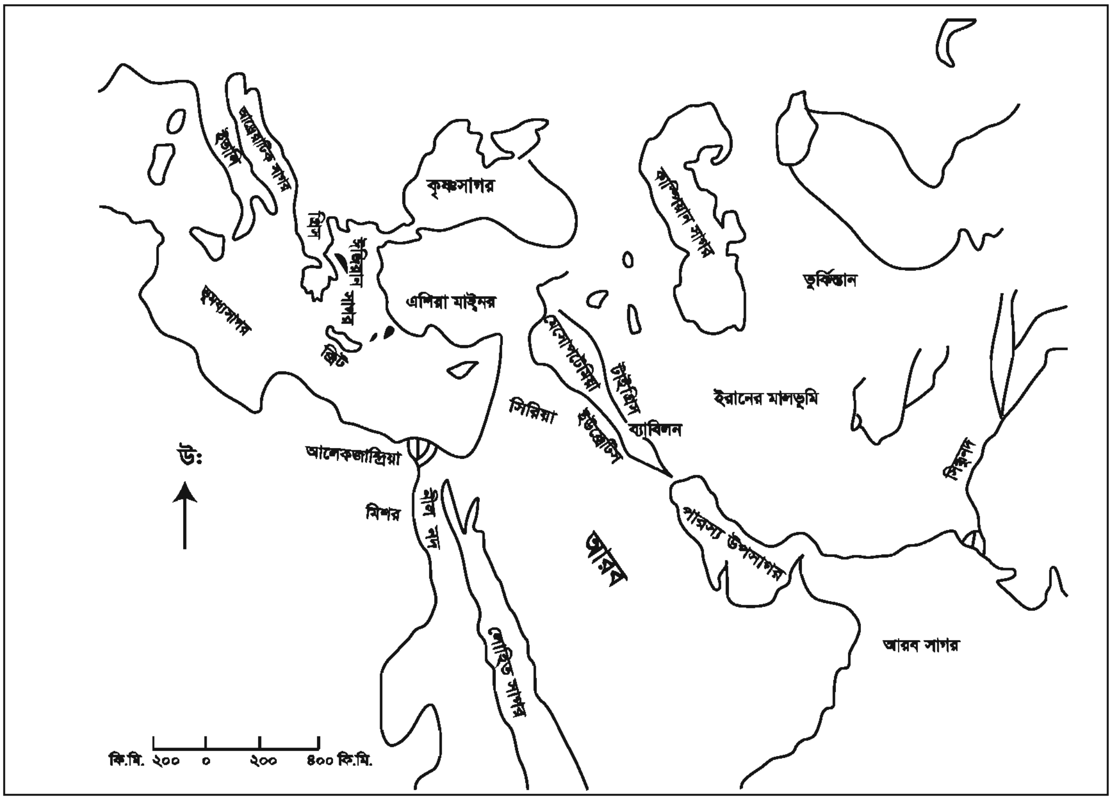

মানচিত্রে কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা

মেসোপটেমীয় সভ্যতা : ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরের উর্বর ভূমিতে মেসোপটেমীয় সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। যেমন- সুমেরীয় সভ্যতা, পুরাতন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, এশেরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় বা নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে।

২০২০

মেসোপটেমিয়াতে একটি বিশেষ ধরনের লিপির উদ্ভব হয়। এর নাম কিউনিফর্ম। মিশরের মতো পিরামিড তৈরি না হলেও চমৎকার ধর্মমন্দির তৈরি হয়েছিল। একে বলা হয় জিগুরাত। মেসোপটেমিয়ার সবকটি সভ্যতাই নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। এর মধ্যে পুরাতন ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি আইন সংকলন তৈরি করেছিলেন। এশেরীয়রা যুদ্ধবিদ্যায় ছিল খুবই পারদর্শী। নতুন ব্যাবিলন নগরটি ছিল ৫৬ মাইল দীর্ঘ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সম্পূর্ণ দেয়ালের উপর বাগান করা হয়েছিল। ইতিহাসে তা ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান নামে পরিচিত। এছাড়াও দালানকোঠা নির্মাণ, মূর্তি তৈরি, বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

চীন সভ্যতা : হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে গড়ে উঠেছিল চীনের নগর সভ্যতা। সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চীনের কয়েকটি রাজবংশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এদের মধ্যে শাং এবং চৌ বংশের সময়কাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চীনারা একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও মূর্তি গড়তে চীনারা ছিল দক্ষ। সবচেয়ে বিস্ময়ের হচ্ছে চীনের মহাপ্রাচীর। চীনকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কয়েক শ বছর ধরে এই প্রাচীরটি তৈরি করা হয়।

মিশরের পিরামিড

ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান

চীনের মহাপ্রাচীর

পারসীয় সভ্যতা : আজকের ইরান দেশটিকে প্রাচীনকালে পারস্য বলা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে পারসীয়রা একটি সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতা বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন সম্রাট প্রথম দারিয়ুস। তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে পারসীয় রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে পারসীয়দের দুইটি বড় অবদান রয়েছে- একটি সাম্রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো, অন্যটি বিশেষ ধর্মীয় কাঠামো। বিশাল সাম্রাজ্য ঠিকমতো পরিচালনার জন্য দারিয়ুস গোটা সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রতি প্রদেশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তৈরি করেছিলেন সড়ক। তিনি ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এতে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ডাক বিভাগের লোকেরা সকল প্রদেশের খবর রাজধানীতে পৌঁছাতে পারত। পারস্য সভ্যতায় চমৎকার স্থাপত্য ও মূর্তি তৈরি হয়েছিল। সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন পারস্যের ধর্ম প্রচারক জরাস্ট্রার। পারসীয়দের প্রশাসন পরিচালনার ধারণা পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অনেক দেশই গ্রহণ করে। তাদের ধর্ম প্রভাব ফেলে বিশ্বের অনেক ধর্মের উপর।

প্রাচীন নগর সভ্যতাগুলোর বেশিরভাগ গড়ে উঠেছিল এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে। ইউরোপে দুইটি নগর সভ্যতা গড়ে উঠে। একটি গ্রিসে আর অন্যটি রোমে।

গ্রিক সভ্যতা : পুরো গ্রিসে একক কোনো রাজ্য বা সাম্রাজ্য গড়ে উঠে নি। খাড়া খাড়া পাহাড়ের মধ্যে এক একটি নগর তৈরি হয়েছিল। এজন্য প্রতিটি নগর পরিণত হয় পৃথক রাষ্ট্রে। এ কারণে গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় নগররাষ্ট্র। নদী না থাকায় কৃষি জমি ছিল না তেমন। তাই সমুদ্রের তীরে বিকাশ ঘটা নগররাষ্ট্রগুলোর প্রধান আয় ছিল বাণিজ্য। বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা অনেক দেশ দখল করে নেয়। গ্রিসে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে। গ্রিসের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্রের একটি এথেন্স আর অন্যটি স্পার্টা। দুইটি নগররাষ্ট্রের কাঠামো ছিল আলাদা। এথেন্সে গড়ে উঠেছিল গণতন্ত্র। আর স্পার্টায় সামরিকতন্ত্র। ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নির্মাণ, দর্শন ও বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই গ্রিস বিশেষ করে এথেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

রোমান সভ্যতা : গ্রিসে সভ্যতা গড়ার কাছাকাছি সময়ে রোমেও নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সামান্য কৃষিকাজ হলেও এই সভ্যতাটিও ছিল বাণিজ্য নির্ভর। রোমানরা ছিল যোদ্ধা জাতি। নানা দেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। জুলিয়াস সিজার, অগাস্টাস সিজার এমন সব বিখ্যাত সম্রাট রোমে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। রোমানরা পাথর ও ইট দিয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ধর্মমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাথরের মূর্তি তৈরিতেও প্রাচীন বিশ্বে রোমানরাই সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রোমান বিজ্ঞানীরা।

কাজঃ পৃথিবীর প্রাচীন নগর সভ্যতাগুলোর নাম, সময়, গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হরপ্পাতে পাওয়া গেছে কোনটি?

ক. রত্নভাণ্ডার গ. বিশ্রামাগার

খ. গ্রন্থাগার ঘ. শস্যাগার

২. উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে-

i. অলংকৃত বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র

ii. কাচের পুঁতির তৈরি অলংকার

iii. চুন ইট দ্বারা নির্মিত রাস্তা

২০২০

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   গ. i ও ii

খ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

ক		খ	
১.	সবাই আইন মেনে চলে	১.	শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা
২.	কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা	২.	শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষার কৌশল গ্রহণ
৩.	একই স্থানে অনেক সভ্যতার জন্ম	৩.	ব্রোঞ্জের শিল্পকর্ম
১ নং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য		**২ নং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য**	

৩. **১ নং সভ্যতায় কোন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?**

ক. মেসোপটেমীয়   খ. পারসীয়

গ. মিশরীয়   ঘ. রোমান

৪. **১ ও ২ নং সভ্যতার সাদৃশ্য হলো-**

ক. নদীভিত্তিক সভ্যতা   খ. আইনভিত্তিক সভ্যতা

গ. প্রশাসনভিত্তিক সভ্যতা   ঘ. সামরিকতন্ত্রভিত্তিক সভ্যতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **দৃশ্যকল্প- ১**

মিতুর শ্রেণি শিক্ষক ক্লাসে একটি ভিডিও চিত্র দেখাচ্ছিলেন। সেখানে মিতু দেখতে পেলো মানুষ নদীর পানিকে কাজে লাগিয়ে নানারকম খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে। খাদ্যের নিশ্চয়তার পর তারা তাদের বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে চাকাযুক্ত গাড়ি তৈরি করে। বাড়িঘরগুলো নতুনভাবে তৈরি করে তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে।

দৃশ্যকল্প- ২

রাফি তার গ্রামের সকলকে নিয়ে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ছোট ছোট ড্রেন কাটার ব্যবস্থা করে বড় ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন করল। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ডাস্টবিনের ব্যবহার করল।

ক. বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন চিত্রশিল্প কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

খ. প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলোকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মিতুর ভিডিও চিত্রে দেখা পরিবর্তনকে কী বলে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. "রাফির কাজে সিন্ধু সভ্যতারই প্রভাব লক্ষণীয়"-বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

২০২০

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্ব-ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ

পৃথিবীর কোনো বৃহৎ অবিরাম-অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে মহাদেশ বলা হয়, যা সাধারণত পানিরাশি দ্বারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ রয়েছে। আমাদের দেশটি যে মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত তার নাম এশিয়া। এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। শুধু আয়তনে নয়, জনসংখ্যার দিক দিয়েও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। আর বাংলাদেশ এই মহাদেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পৃথিবীর বুকেও গর্বিত একটি দেশের নাম বাংলাদেশ। দীর্ঘ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও ১৯৭১-এ একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে এই দেশটি তার স্থান করে নিয়েছে।

মহাদেশ ছাড়াও রয়েছে মহাসাগর যেমন- প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর। বাকি দুইটি মহাসাগর হলো উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। এসব মহাসাগর মহাদেশগুলোর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। মহাসাগর ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে কয়েকটি বড় সাগর বা সমুদ্র। যেমন- আরবসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি। আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এটি আসলে একটি উপসাগর, যা ভারত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অর্থনীতি, ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্ব পরিমণ্ডলে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান ও এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- মানচিত্র অঙ্কন করে এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান নির্দেশ করতে পারব।

পাঠ-১ : মহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি, পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা। পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র ২৯ ভাগ হচ্ছে স্থলভাগ। বাকি অংশ জলরাশি। এই জলরাশির মধ্যেও রয়েছে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ। এগুলো মহাদেশগুলোর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কোনো না কোনো মহাদেশেরই অংশ। দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর। এগুলোতে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র।

পৃথিবীর স্থলভাগের সকল স্থান সমতল নয়। সমতল ভূমি ছাড়াও পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, বনভূমি, নদনদীসহ অনেক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সেখানে রয়েছে। কোনো কোনো দেশ আছে যা দ্বীপ বা দ্বীপের সমষ্টি। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে ও ভারতীয় উপমহাদেশে।

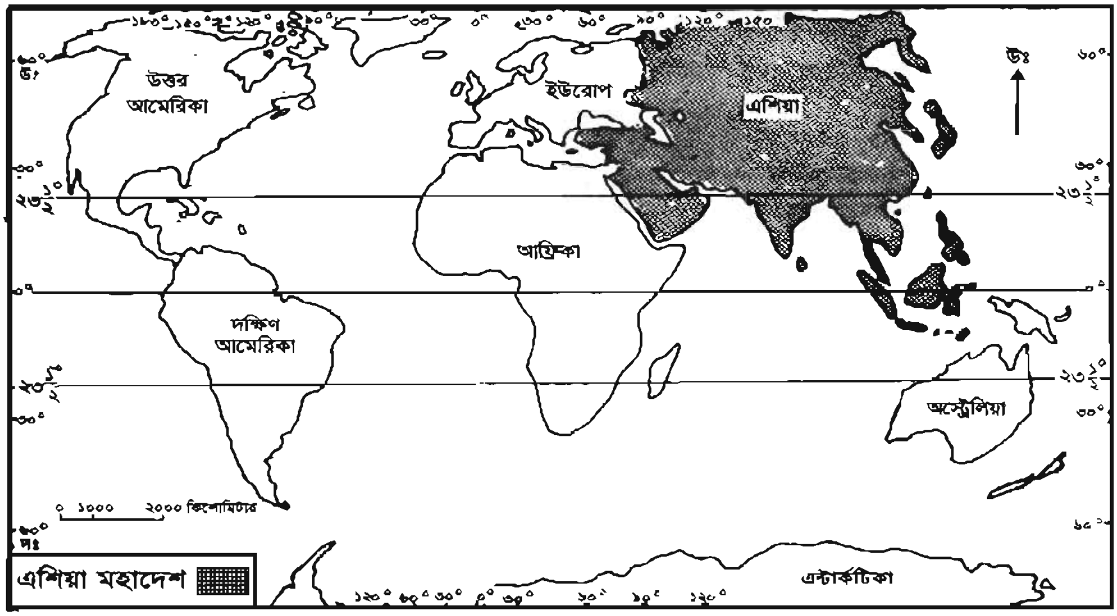

পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়াসহ বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান

কাজ : বিশ্বমানচিত্রে সাতটি মহাদেশ চিহ্নিত কর।

পাঠ- ২ ও ৩ : এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন

পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার আয়তন ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার (সূত্র : এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা)। ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন যোগ করলে কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে একত্র করলেও এশিয়ার সমান হবে না। ৪৪২ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের বাস এই মহাদেশে (২০১৪ এর হিসাব অনুযায়ী)। শুধু আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকেই যে এশিয়া বৃহত্তম মহাদেশ তা-ই নয়, এখানেই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতা। সুদূর অতীতে চীন, মেসোপটেমীয়, পারসীয়, হিব্রু এবং সিন্ধু সভ্যতা এখানেই গড়ে উঠে। এশিয়ায় যখন এসব সভ্যতা গড়ে উঠে তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় সভ্যতার আলো পৌঁছে নি। সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন চীনের মহাপ্রাচীর ও ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান এ মহাদেশেই অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল সমতল। এর উত্তরে যেমন আছে বরফে আচ্ছাদিত এলাকা সাইবেরিয়া, তেমনি পশ্চিমে আছে উত্তপ্ত মরুভূমি। দক্ষিণ

২০২০

ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে নদী বিধৌত নিম্ন সমভূমি। এ ছাড়া এ মহাদেশের ভূপ্রকৃতির মধ্যে পূর্বদিকের আগ্নেয় দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। পৃথিবীর বড় নদীগুলোর সাতটিই এশিয়া মহাদেশে প্রবাহিত। সেই সাথে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ৮৮৫০ মিটার উঁচু মাউন্ট এভারেস্ট এ মহাদেশে অবস্থিত। ব্রিটিশ-ভারতের জরিপ বিভাগের প্রধান স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে শৃঙ্গটির নাম রাখা হয়েছে মাউন্ট এভারেস্ট। তবে এর উচ্চতা মেপেছিলেন এক বাঙালি, নাম–রাধানাথ শিকদার। এই পর্বতসমূহ ও নিকটবর্তী পর্বত সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। নেপালের তেনজিং শেরপা ও নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি ১৯৫৩ সালে প্রথম এভারেস্ট পর্বত চূড়ায় আরোহণ করেন। বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরীনও এই পর্বত চূড়ায় আরোহণ করেছেন।

মাউন্ট এভারেস্ট

তেনজিং শেরপা

এডমন্ড হিলারি

এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুও বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিরক্ষরেখা থেকে ১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়। সারা বছর অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মকাল ও বৃষ্টিবিহীন শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, ফিলিপাইন, চীন ও জাপানের দক্ষিণাংশে মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। বৃষ্টিহীনতা ও উষ্ণতার পার্থক্য মধ্য এশিয়ায় মরু অঞ্চলের জলবায়ু সৃষ্টি করেছে। শীতকালে বৃষ্টি কিন্তু গ্রীষ্মকালে সাধারণত বৃষ্টিহীনতা-এরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাজ : 'এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রকার জলবায়ু দেখা যায়'- এ সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২০১৮

পাঠ- ৪ : এশিয়ার জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও ধর্ম

জনসংখ্যা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগের বেশি মানুষ বাস করে এশিয়া মহাদেশে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি। এর মধ্যে এশিয়ার লোকসংখ্যা ৪৪২ কোটি ৭০ লক্ষ। এ হিসাবে বিশ্বের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ লোকের বসবাস এই মহাদেশে। এশিয়ার মোট এলাকা পৃথিবীর মোট ভূভাগের মাত্র তিন ভাগের একভাগ। তার মানে এই মহাদেশটিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি। মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় তুলনামূলকভাবে কম মানুষ বাস করে। কিন্তু পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের দেশগুলো ঘন জনবসতিপূর্ণ। এশিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস এ এলাকায়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। জনসংখ্যা ও আয়তনে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ চীন, আর ছোট দেশ মালদ্বীপ। চীনের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি- ১৩৭ কোটি ২০ লক্ষ, তারপরের স্থানটি ভারতের ১৩১ কোটি ৪০ লক্ষ। আর মালদ্বীপের জনসংখ্যা ৩ লক্ষ (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট-২০১৫)।

অর্থনীতি

এশিয়া মহাদেশটি কৃষিপ্রধান। ধান উৎপাদনে এ মহাদেশ শীর্ষস্থানীয়। চীন পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। একইভাবে ভারত প্রধান পাট উৎপাদনকারী ও বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। চা উৎপাদনে বিশ্বে চীন প্রথম, ভারত দ্বিতীয় এবং শ্রীলঙ্কা চতুর্থ। এ মহাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এর ভূগর্ভে তেল, গ্যাস, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লোহা, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায়। জ্বালানি তেল ছাড়া শিল্প-কারখানা ও যানবাহনসহ, বলতে গেলে সারা পৃথিবীই অচল। পৃথিবীর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, আরব আমিরাত ও কুয়েতে উত্তোলন করা হয়। সারা বিশ্ব এ অঞ্চলের তেলের উপর নির্ভরশীল। সাগর-মহাসাগর ও নদ-নদীর সুবিধা থাকায় প্রাচীনকাল থেকেই এ মহাদেশের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠে। এ মহাদেশের চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারত শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছে। জাপান পৃথিবীর তৃতীয় শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশও তৈরি পোশাক শিল্পে এগিয়ে আছে।

ধর্ম

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ধর্মের উদ্ভব এশিয়ায়। প্রাচীন ধর্মের মধ্যে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধধর্মের জন্ম এশিয়াতেই। এরপর ইহুদি ও পরে খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য থেকেই সপ্তম শতকে ইসলামধর্ম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সৌদি আরবের মক্কায় মুসলমানদের পবিত্র কাবা শরিফ অবস্থিত। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান গয়া ও কাশী এবং বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ বুদ্ধগয়া ভারতে অবস্থিত। পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পবিত্র ধর্মস্থান জেরুজালেম শহরে অবস্থিত।

কাজ : রাজধানীসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২০২০

পাঠ - ৫ ও ৬ : এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান

আমরা জানি মানচিত্রের উপরের দিককে উত্তর, নিচের দিককে দক্ষিণ, ডান দিককে পূর্ব এবং বাম দিককে পশ্চিম ধরা হয়। এবার আমরা মানচিত্র দেখে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান জেনে নিই।

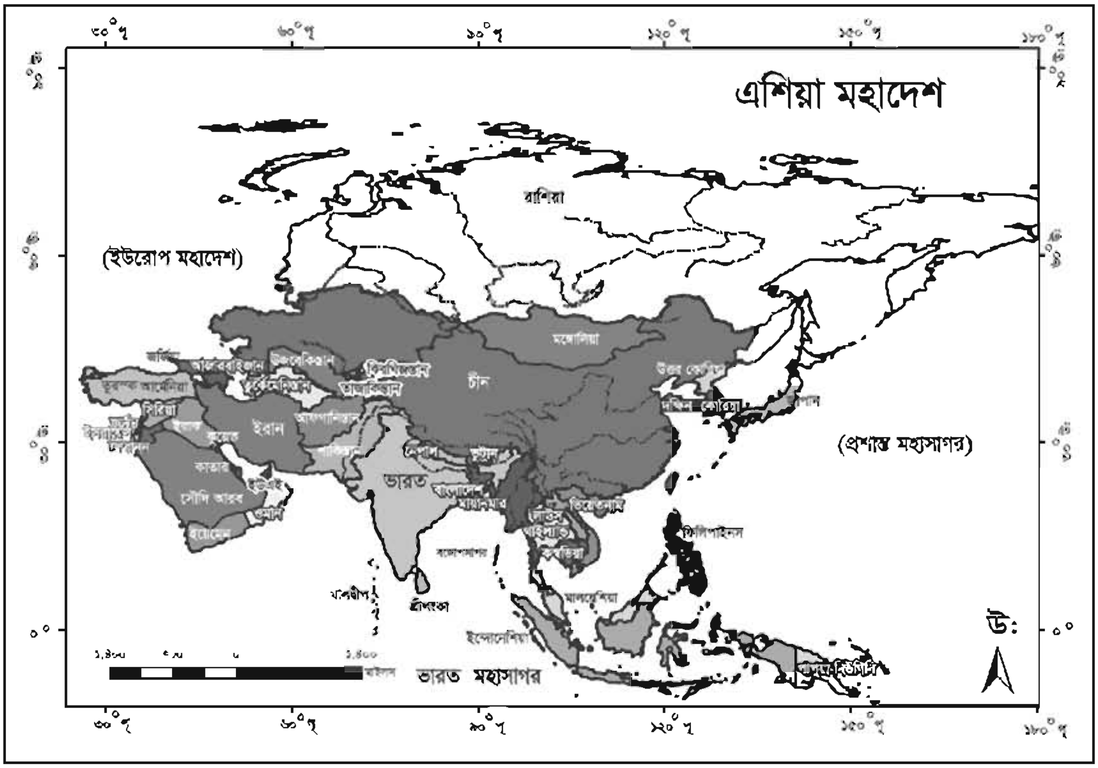

এশিয়া মহাদেশের মানচিত্র ও সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান

এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এ মহাদেশের উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো- ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র। চীনের ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬৩০০ কিলোমিটার।

এশিয়ার উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলো হলো- চীন, ভারত, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এশিয়া বা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখব, একেবারে পূর্বপ্রান্তের দেশটির নাম জাপান। জাপানকে তাই 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলা হয়। চীন ও জাপান দুইটি দেশই শিল্পায়নে শুধু এশিয়ার মধ্যে নয়, পৃথিবীর মধ্যেও প্রধান অবস্থানে আছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতও এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ অংশে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান। আমাদের দেশটি নদীমাতৃক এবং কৃষিপ্রধান। এ দেশের প্রায় তিনদিক জুড়ে আছে ভারত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা সীমান্ত আছে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সাথে। ছয় ঋতুর দেশ হলেও বর্ষাই এ দেশের অন্যতম ঋতু। এ দেশ একটি উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চল। নদীর পলি দিয়েই গঠিত হয়েছে এদেশের ভূমি। আমাদের তিনটি প্রধান নদী-পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা। অন্যান্য বড় নদীগুলো হলো- ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, সুরমা, কর্ণফুলি, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি। অধিকাংশ নদীর উৎস ভারতে। আমাদের নদীগুলো বর্ষায় ফুলেফেঁপে প্রায়ই ভয়ংকর হয়ে উঠে। যেমন তারা পলি বয়ে এনে জমি তৈরি করে তেমনি পুরানো অংশে ভাঙন চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি আরও দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা বন্দর দিয়ে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে জাহাজযোগে যা কিছু আমদানি-রপ্তানি করা হয় তা এ বন্দর তিনটির মাধ্যমে হয়। বঙ্গোপসাগরের তীরে কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এছাড়া টেকনাফ, সেন্টমার্টিন এবং পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতও আমাদের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

শুধু সমুদ্রই নয়, আমাদের রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম শ্বাসমূলীয় বনভূমি (ম্যানগ্রোভ) সুন্দরবন। এখানেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বন্যপ্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। প্রাণীর আবাসস্থল ও সৌন্দর্যের জন্য সুন্দরবন 'বিশ্ব ঐতিহ্য' মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের দেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা তিনটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিনডং (বিজয়) বান্দরবানে অবস্থিত। এর উচ্চতা ১২৩১ মিটার। আমরা এর আগে জেনেছি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৫০ মিটার। যদিও এভারেস্টের তুলনায় তাজিনডং অনেক নিচু, তবুও আমরা নিজেদের উচ্চতম পর্বত নিয়ে গর্ব করি।

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশীদার সুন্দরবন

বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। সামান্য পরিমাণ উচ্চভূমিও রয়েছে। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই দুইটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডে ১০,০৪১.২৫ একর জমি যোগ হয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা মামলার রায় বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ প্রায় এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জলসীমা পেয়েছে। এ দেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন (সূত্রঃ আদমশুমারি-২০১১)। বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। কৃষিপ্রধান এ দেশটির উন্নতির প্রধান অন্তরায় দ্রুত ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

কাজ - ১ : বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত কর।

কাজ - ২ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি বিবরণ দাও।

পাঠ - ৭ ও ৮ : পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব

বারিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর বলে। আর মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে। সাগর হলো পৃথিবীর সকল মহাসাগরীয় পানির আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৭১ শতাংশ পানি এবং ২৯ শতাংশ স্থলভাগ। এবার আমরা প্রথমে কয়েকটি মহাসাগরের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হব। তারপর জানব আমাদের বঙ্গোপসাগরের কথা।

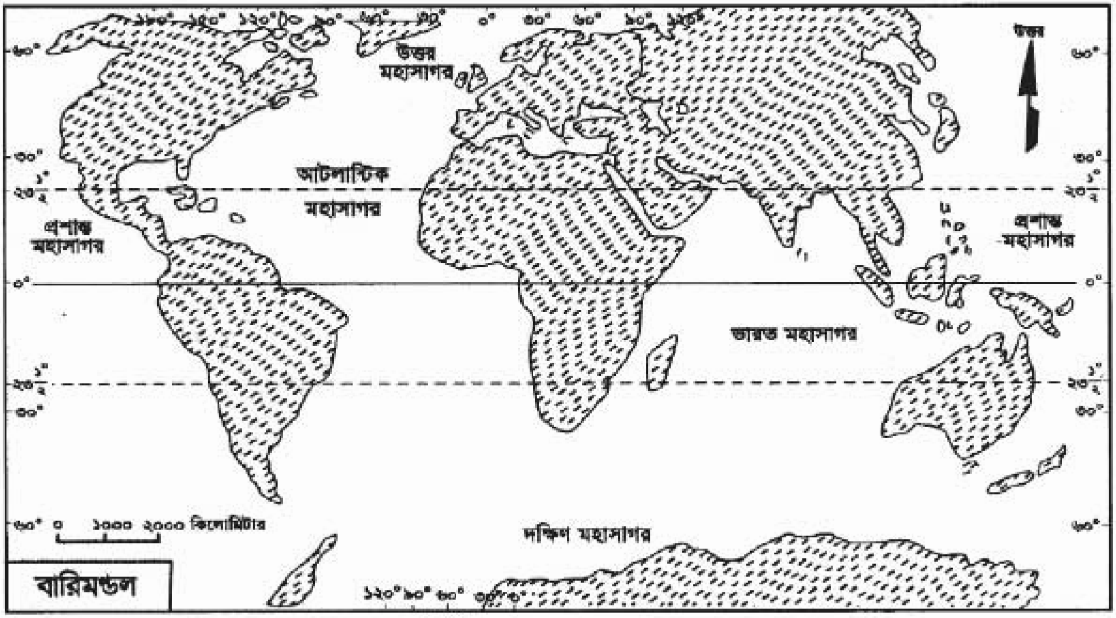

পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

প্রশান্ত মহাসাগর

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর। এর এই নামের পিছনে একটি কাহিনি আছে। পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনান্দ মুজালিন অথবা ম্যাজিলন এ মহাসাগরের নাম দেন প্যাসিফিক। প্যাসিফিক শব্দের অর্থ শান্ত। এর জলরাশির শান্ত রূপ দেখে তিনি এর নামকরণ করেন। পানির বিস্তার, গভীরতা ও আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর। পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ স্থান জুড়ে আছে এই মহাসাগর। এটি পৃথিবীর অর্ধেক পানির আধার। এ মহাসাগরে ২৫ হাজারেরও বেশি দ্বীপ রয়েছে। এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্যসব সাগর-মহাসাগরের দ্বীপের অর্ধেক। প্রশান্ত মহাসাগরে মিশেছে এমন সাগরগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান সাগর, পীত সাগর ও চীন সাগর।

আটলান্টিক মহাসাগর

প্রাচীনকালে রোমানরা সম্ভবত আটলাস পর্বতের নামানুসারে এই মহাসাগরের নাম দেন আটলান্টিক। আবার অনেকে মনে করেন রূপকথার হারানো রাজ্য আটলান্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের নামকরণ হয়েছে। মহাসাগরগুলোর মধ্যে আয়তনে এটি দ্বিতীয় হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম। এ মহাসাগর দখল করে আছে পৃথিবীর ২০ শতাংশ জায়গা। আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর আটলান্টিক ও দক্ষিণ আটলান্টিক এই দুইভাগে বিভক্ত। এ মহাসাগরের পূর্ব দিকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর্কটিক মহাসাগর ও এন্টার্কটিক মহাসাগর। গভীরতার দিক থেকে এ মহাসাগরের স্থান তৃতীয়।

ভারত মহাসাগর

মহাসাগরগুলোর মধ্যে ভারত মহাসাগর আয়তনের দিক থেকে তৃতীয় এবং গভীরতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জলরাশি এ মহাসাগর ধারণ করে আছে। এ মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত। এ মহাসাগরের উত্তরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর।

বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত জলরাশির নাম বঙ্গোপসাগর। এটি আসলে ভারত মহাসাগরেরই উত্তর দিকের প্রশস্ত অংশ। আমাদের ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, কর্ণফুলিসহ অসংখ্য নদ-নদীর জলপ্রবাহ এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। এছাড়া ভারতের গঙ্গা, যমুনা, মহানন্দা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীসহ অনেক নদী এসে মিশেছে এখানে। মিয়ানমারের ইরাবতী ও নাফ নদীও এসে মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে।

এই সাগরের উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বদিকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ অংশ এবং পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে আরও রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের আয়তন প্রায় বাইশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এ সাগরের গড় গভীরতা পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি।

বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। এ ছাড়াও রয়েছে মহেশখালী, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপ। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বঙ্গোপসাগরের নিকটে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবস্থিত। দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর মংলাও বঙ্গোপসাগরের নিকটেই অবস্থিত। পটুয়াখালীর পায়রা নদীর মোহনায় রয়েছে বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অন্য বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারতের কলকাতা, চেন্নাই, শ্রীলঙ্কার কলম্বো এবং মিয়ানমারের ইয়াংগুন ও আকিয়াব।

বঙ্গোপসাগর নানা কারণে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রধান সংযোগপথ এই বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়েই। বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়। এ বৃষ্টির ফলেই কৃষিনির্ভর আমাদের দেশে নানা ফসল জন্মায়। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে প্রচুর মৎস্যসম্পদ। প্রায় পাঁচ শ' প্রজাতির মাছ রয়েছে এ সাগরে। যার মধ্যে রূপচাঁদা, ইলিশ, ছুরি, লইট্যা, ফাইস্যা, পোয়া, কোরাল প্রভৃতির নাম করা যায়। শুধু দশ রকমের চিংড়িই রয়েছে এ সাগরে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব মাছ বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে বিপুল গ্যাসসম্পদ। আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীরা বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করে। তাতে দেশের লবণের চাহিদার প্রায় সবটুকু মিটে যায়। সাগরের শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক সংগ্রহ করেও অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে। কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে ঝিনুকশিল্প। বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। আমরা আগেই জেনেছি এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। বাংলাদেশ সরকার মহেশখালি দ্বীপের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরের বুকে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২০২০

মহাসাগর ও সাগরের গুরুত্ব

পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাগর ও মহাসাগরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের উপকূল হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে উপনীত হন। এতে পশ্চিমের সাথে পূর্বের যোগাযোগের পথ খুলে যায়। বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগর মৎস্যসম্পদে ভরপুর এবং এদের তলদেশে বিভিন্ন খনিজসম্পদ রয়েছে। মৎস্য শিকার সাগর-মহাসাগরের উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উপজীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ যেমন- জিরকন, মোনাজাইট, লিমোনাইট, সীসা, লোহা, তামা ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান। অষ্টম শতকে আরবের বণিকেরা আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার প্রসারও ঘটে এভাবে। সাগর ও মহাসাগরগুলোর নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে অনেক মনোরম পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

কাজ - ১ : বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থানের একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ - ২ : বঙ্গোপসাগর কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে সেগুলো প্রদর্শন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কী?

ক. ইয়াংসিকিয়াং গ. ইউফ্রেটিস

খ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. হোয়াংহো

২. এশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ বলার কারণ হলো, এ মহাদেশে-

i. জনসংখ্যা ও আয়তন সর্বাধিক

ii. সর্বপ্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল

iii. প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

নিচের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

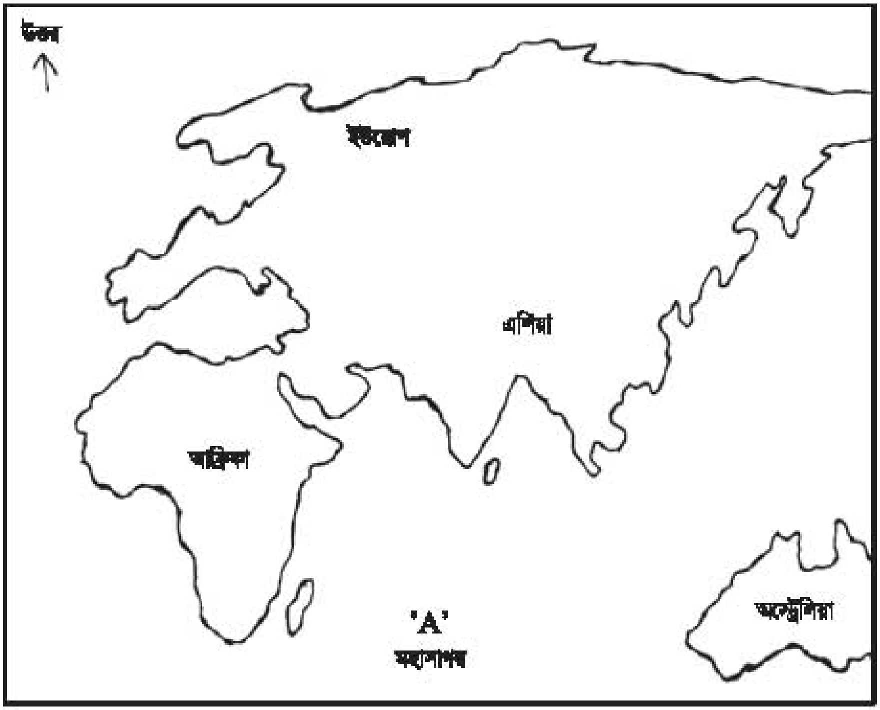

৩. চিত্রের 'A' চিহ্নিত মহাসাগরটির নাম কী?

ক. প্রশান্ত মহাসাগর
গ. আটলান্টিক মহাসাগর
খ. ভারত মহাসাগর
ঘ. উত্তর মহাসাগর

৪. উক্ত চিহ্নিত মহাসাগরটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ-

i. এটি পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর

ii. পৃথিবীর ২০ শতাংশ স্থান জুড়ে এ মহাসাগরের অবস্থান

iii. সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে এটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. iii
খ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

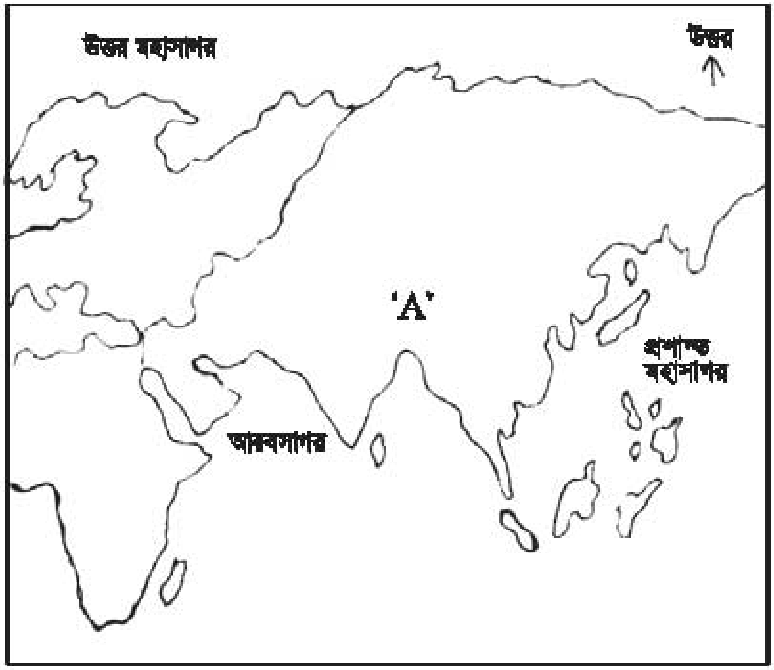

ক. পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?

খ. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠে কেন?

গ. চিত্রের 'A' চিহ্নিত মহাদেশটির ভূপ্রকৃতি কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত মহাদেশটির কোনো ভূমিকা আছে কী? তোমার মতামত দাও।

২. বার্ষিক পরীক্ষা শেষে রুহি মা-বাবার সঙ্গে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়েছে। রুহি সেখানে দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক দেখতে পেল। বাবা বললেন, এই যে বিশাল জলরাশি দেখছ এটি একটি উপসাগর এবং অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার।

ক. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কী?

খ. জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মানচিত্র অঙ্কন করে রুহির দেখা জলরাশির অবস্থান চিহ্নিত কর।

ঘ. রুহির বাবা উপসাগরটিকে অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

২০২৫

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি

আমাদের দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। এদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটার জায়গায় ১০১৫ জন মানুষ বাস করে (আদমশুমারি-২০১১ অনুযায়ী)। জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে আমাদের দেশ এখন পৃথিবীর অষ্টম স্থানে রয়েছে। আমরা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনেছি। তখন জনমিতি বিষয়ে আমাদের কোনো কিছু জানা হয় নি। এ অধ্যায়ে আমরা জনমিতি ও জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- জনমিতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ যথা-জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, বিবাহ ও সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তরগমন সম্পর্কিত তারতম্যের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারব।

পাঠ-১ : জনমিতির ধারণা

সুমাইয়া তার ছোট ভাই সুপলকে সংখ্যা শেখাতে গিয়ে তাদের পরিবারে কতজন মানুষ আছে তা গণনা করে বের করতে বলে। মহাউৎসাহে সুপল শুধু নিজ পরিবারেরই নয়, তাদের তিন তলার বাসায় মোট কত লোক বাস করে তা বের করতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। এভাবে কোনো পাড়া, মহল্লা কিংবা রাষ্ট্রে কতজন মানুষ আছে তা হিসাব করে বের করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন জন্ম নিল, কতজন মারা গেল, কোন বয়সের কতজন লোক আছে, কতজনের বিয়ে হলো, কতজন অন্য স্থানে চলে গেল কিংবা কতজন অন্য স্থান থেকে এলো তা গণনা করে বের করা যায়। এভাবে কোনো রাষ্ট্র বা স্থানের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের হিসাব নির্ধারণ করা বা পরিমাপ করাই জনমিতি।

জনমিতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। এর একটি হলো 'জন' যার অর্থ ব্যক্তি বা মানুষ, আর অপরটি হলো 'মিতি' যার অর্থ পরিমাপ বা বিবরণ বা পরিমাণ। সুতরাং জনমিতি বলতে জনসংখ্যার পরিমাপ বা বিবরণকে বোঝায়। জনমিতিকে জনবিজ্ঞানও বলে।

কাজ : জনমিতি সম্পর্কে জানতে হলে কী কী বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে?

পাঠ- ২, ৩ ও ৪ : জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ হলো-জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর, বিবাহ, সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি।

স্বর্ণা, দীপ্তি, সাদী, শিহাব, সৌম্য, আহসান সমবয়সী। স্বর্ণার একটি ছোট ভাই হয়েছে শুনে স্বর্ণার সব বন্ধুরা মিলে তাকে দেখতে এলো। সাদী জানাল, তাদের পরিবারে তার ছোট চাচার একটি মেয়ে হয়েছে। দেখতে খুব সুন্দর। দীপ্তি বলল, তার বড় ভাই আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এ আলাপচারিতায় শিহাব জানাল, তার বড় ভাই বিয়ে করেছে। কিন্তু সৌম্যের মন খুব খারাপ। কিছু দিন হলো সৌম্যের বাবা মারা গেছে। আহসান অবশ্য আনন্দিত কারণ তার ছোট মামা উঁচু মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পেয়ে খুলনা থেকে ঢাকায় চলে এসেছে এবং এখন থেকে তাদের সাথেই থাকবে।

স্বর্ণার ভাই হওয়ায়, সাদীর ছোট চাচার মেয়ে হওয়ায়, শিহাবের ভাই বিয়ে করায় এবং আহসানের ছোট মামা তাদের সাথে থাকতে শুরু করায় তাদের প্রত্যেকের পরিবারে লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। অপরদিকে দীপ্তির বড় ভাই আমেরিকায় চলে যাওয়ায়, সৌম্যের বাবার মৃত্যু হওয়ায় তাদের দুই জনের পরিবারের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে। তাহলে যেকোনো পরিবারের সদস্য সংখ্যা কখনো বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে। অর্থাৎ এ সংখ্যা পরিবর্তনীয়। এই পরিবর্তন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, স্থানান্তর, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে হয়েছে। তেমনি কোনো দেশের জনসংখ্যাও সে দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার, বিবাহ, স্থানান্তর, সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি উপাদানের কারণে বাড়তে বা কমতে পারে অর্থাৎ তা পরিবর্তন হতে পারে। এখন আমরা জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী এসব উপাদান সম্পর্কে জানব।

জন্মহার : সাধারণত জন্মহার বলতে কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (এক বছরে) প্রতি হাজার নারী মোট কত সংখ্যক জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছে সে সংখ্যাকে বোঝায়। জন্মহার বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে জন্মহার বেশি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মহার কম।

মৃত্যুহার : সাধারণত জীবনের নিঃশেষকে মৃত্যু বলে। মৃত্যুহারও প্রতি হাজারে পরিমাপ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বছরে নির্দিষ্ট বয়সের লোক প্রতি হাজারে কতজন মারা যায় তা দ্বারা মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়। মৃত্যুহার কমে যাওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য

প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার ১৯৯০ সালে ছিল প্রতি হাজারে ১৪৪ জন। কিন্তু শিশু মৃত্যুহার ২০১৫ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৩৮ জন।

স্থানান্তর : স্থানান্তর বলতে একটি দেশের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা একটি দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে মানুষের গমনাগমনকে বোঝায়। স্থানান্তর দুই ধরনের। একটি অভ্যন্তরীণ অন্যটি আন্তর্জাতিক। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর দেশের ভিতরের স্থানান্তর। দেশের ভিতরে গ্রাম হতে শহরে, গ্রাম হতে গ্রামে, শহর হতে গ্রামে, শহর হতে শহরে মানুষ স্থানান্তর হলে তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা হয়। তবে বাজার করা, অফিস করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা যায় না। দেশের বাইরে অর্থাৎ অন্য দেশে লোকজন চাকরি, বিয়ে, বসবাস এমনকি নাগরিকতা লাভের জন্য গমন করলে তাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলে। তবে স্থানান্তর দেশের ভিতরে হলে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা ঘাটতি হয় না। কিন্তু তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে হলে মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়।

বিবাহ : কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্মহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সামাজিক গতিশীলতা : সামাজিক গতিশীলতা বলতে মূলত সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তনকে বোঝায়। যেমন, কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারের কোনো সদস্য যদি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ পেশার চাকরিতে প্রবেশ করে তবে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটবে। ফলে তার মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং সন্তান সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখবে।

কাজ - ১ : জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ - ২ : দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ধরনের স্থানান্তর উদাহরণসহ উপস্থাপন কর।

পাঠ- ৫ ও ৬ : জন্মহার তারতম্যের কারণ ও প্রভাব

পৃথিবীর সব দেশে জনসংখ্যা সমান নয়। কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি আবার কোনো দেশে জনসংখ্যা কম। দরিদ্র দেশে জন্মহার বেশি আবার ধনী দেশে জন্মহার কম হয়ে থাকে। কেন এমন হয়? জন্মহার কম বা বেশি হলে তা সমাজ ও অর্থনীতির উপর কী প্রভাব ফেলে এ পাঠে আমরা তা জানব।

জন্মহার তারতম্যের কারণ

বিভিন্ন কারণে জন্মহারের তারতম্য বা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন-

জলবায়ু : শীত প্রধান দেশের তুলনায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি। এখানে জনগণ অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান করতে সক্ষম হয়। তাই শীত প্রধান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম আর গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই হার বেশি।

শিক্ষা : শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ হয় অজ্ঞ, কুসংস্কারচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল। ফলে জন্মহার বৃদ্ধির কুফল বুঝতে তারা অক্ষম হয়। জন্মহার বৃদ্ধি রোধ কঠিন হয়ে পড়ে। উন্নত দেশে শিক্ষার হার বেশি। শিক্ষিত জনগণ আয়-ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাই তারা কম সন্তান নেয়। কাজেই শিক্ষার হার বেশি হলে জন্মহার কম হয়।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ : কোনো সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে জন্মহার বেশি হয়। বহুবিবাহও জন্মহার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী, বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অনুন্নত জীবনযাত্রা : দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা নিম্ন হয়। সন্তানের ভরণপোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিতে তাদের বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এ কারণে বেশি সন্তান জন্ম দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না।

নবজাতকের মৃত্যুহার : যেখানে নবজাতকের মৃত্যুহার বেশি সেখানে মা-বাবা জীবিত সন্তানের আশায় অধিক সন্তানের জন্ম দেয়। তাই নবজাতকের মৃত্যুহার বেশি হলে জন্মহারও বেশি হয়।

এছাড়াও বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার অভাব, পুত্র সন্তান কামনা ইত্যাদি জন্মহার বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে।

জন্মহার তারতম্যের প্রভাব

জন্মহারের হ্রাস-বৃদ্ধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। একটি দেশের ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় যদি জন্মহার বেশি হয় তাহলে দেশটির ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বাড়বে। মানুষের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হবে। আবার বাড়তি চাহিদা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন, দেশের জাতীয় আয় কমে যায়। খাদ্য ঘাটতি, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। জীবনযাত্রার মান হয় নিম্ন। মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। কেননা, জন্মহার বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়ে জীবাণু দ্রুত ছড়ায়। সুতরাং ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জন্মহার বেশি হলে তা যেকোনো দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না। অপরদিকে একটি দেশে যে পরিমাণ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে, তার তুলনায় যদি জন্মহার কম হয় তবে কম জনসংখ্যার জন্য দেশের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ দেশের সম্পদের তুলনায় জন্মহার কম হলে তাও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হয় না। এজন্য দেশের সম্পদের কথা বিবেচনা করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

কাজ - ১ : জন্মহার হ্রাস-বৃদ্ধির পাঁচটি কারণ চিহ্নিত কর।

কাজ - ২ : দলে ভাগ হয়ে জন্মহার বৃদ্ধির ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে তার তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৭ : মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ ও প্রভাব

জন্মহারের মতো মৃত্যুহারও বিশ্বের সকল দেশে সমান নয়। কোনো দেশে মৃত্যুহার বেশি আবার কোনো দেশে মৃত্যুহার কম।

মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ

বিভিন্ন কারণে মৃত্যুহারের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন-

ভৌগোলিক কারণ : ভৌগোলিক অবস্থান ও উপাদান মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে। যেসব দেশ বা এলাকার অবকাঠামো, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু চরমভাবাপন্ন নয় সেসব দেশ বা এলাকায় মৃত্যুহার কম।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা : যেসব স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বেশি সেসব স্থানে মৃত্যুহার বেশি। আবার যেসব এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ক্রুটিপূর্ণ বা বিভিন্ন নির্মাণ কাজে সাবধানতা অবলম্বনের অভাব রয়েছে সেসব এলাকাতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহার বেশি।

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি : যেসব এলাকায় কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, হুপিংকাশি, হাঁপানি ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের (যেমন-জিকা ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাস, মার্কস ভাইরাস ইত্যাদি) প্রকোপ বেশি সেসব এলাকায় মৃত্যুহার বেশি।

বয়স : বয়স কাঠামো মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে। যে সমাজে অল্প বয়সী (শিশু) ও অধিক বয়সী (বৃদ্ধ) লোক বেশি, সে সমাজে মৃত্যুহার বেশি।

দারিদ্র্য : দরিদ্র জনগণ পুষ্টিসম্মত খাবার খেতে পারে না। উন্নত স্বাস্থ্যসেবাও নিতে পারে না। জীবনযাত্রার মান থাকে নিম্ন। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি সহজেই তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মারাও যায় বেশি। এজন্য উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশে মৃত্যুহার বেশি।

যুদ্ধবিগ্রহ : বিশ্বের যেসব দেশে যুদ্ধবিগ্রহ বেশি সেসব দেশে মৃত্যুহার বেশি। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু এলাকায় যুদ্ধবিগ্রহের কারণে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে।

মৃত্যুহার তারতম্যের প্রভাব

মৃত্যুহার তারতম্যে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে থাকে। শিশুমৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুসহ নানা ধরনের অপরিণত বয়সের মৃত্যু দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের ব্যাপক ক্ষতি করে। উচ্চ শিশু মৃত্যুহারের কারণে মা-বাবা আরও বেশি সংখ্যক ছেলে-মেয়ে জন্মদানে উৎসাহিত হয়। মৃত্যুহার বেশি হলে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। মোটকথা অধিক মৃত্যুহার যে কোনো দেশের জন্য খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসে। অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যুহার জনসংখ্যার গঠন, বয়স, বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করে। একসময়ে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুহার ছিল খুবই বেশি। বর্তমানে শিশু মৃত্যুহার অনেক নিচে নেমে এসেছে।

কাজ - ১ : মৃত্যুহার হ্রাস-বৃদ্ধির তিনটি কারণ চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৮ : স্থানান্তর তারতম্যের কারণ ও প্রভাব

বসবাসের স্থান স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করাকে স্থানান্তর বলে। এটি কখনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে হতে পারে আবার কখনো সীমানা অতিক্রম করে হতে পারে।

স্থানান্তর তারতম্যের কারণ

স্থানান্তরের পিছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জনমিতিক কারণ বিদ্যমান থাকে। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মানুষ-

- অধিক আয়ের আশায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হয়।
- বিবাহের কারণে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়।
- উচ্চশিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পেশার আশায় স্থানান্তরিত হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন প্রভৃতি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপাদান যেমন-উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, বিনোদন ও পরিবেশ এর আশায় স্থানান্তরিত হয়।
- যুদ্ধবিগ্রহের কারণে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহু লোক ইউরোপীয় দেশসমূহে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

স্থানান্তরের প্রভাব

সমাজজীবনে স্থানান্তরের প্রভাব অনেক। স্থানান্তরের কারণে মানুষ যে এলাকায় গমন করে সে এলাকা বিস্তৃতি লাভ করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে যায়। যেমন, ঢাকা শহর দশ বছর আগেও সীমিত এলাকা নিয়ে ছিল। কিন্তু এখন এ শহরের বিস্তৃতি ব্যাপক। স্থানান্তরের কারণে অতিরিক্ত লোকের চাপ পড়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে। ফলে মৌলিক প্রয়োজনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। স্থানান্তরের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা, কর্মসংস্থানের অভাব, বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় স্থানান্তর দেশের জনসংখ্যা কাঠামো পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে। আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তাদের প্রেরিত অর্থ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

কাজ : কী কী কারণে স্থানান্তর ঘটে থাকে তা দলে আলোচনা করে চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি জনমিতির উপাদান নয়?

ক. জন্মহার
খ. মৃত্যুহার
গ. জনস্বাস্থ্য
ঘ. স্থানান্তর

২। মৃত্যুহার হ্রাস পেলে নিচের কোনটি ঘটে?

ক. জনসংখ্যা কমে
খ. জনসংখ্যা বাড়ে
গ. সচেতনতা কমে
ঘ. শিক্ষার হার বাড়ে

৩। জন্মহার পরিমাপ করতে নিচের কোনটির প্রয়োজন নেই? নির্দিষ্ট–

ক. সংখ্যা
খ. বয়স
গ. সময়
ঘ. স্থান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে রাজু সবার বড়। এইচএসসি পাশ করার পর সে একটি শীত প্রধান, উন্নত, ও কম জনসংখ্যার দেশে চলে যায়। উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর রাজু সেখানে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। কখনো কখনো দুই সন্তান নিয়ে বাংলাদেশে আসে। অন্যদিকে তার চার ভাই উচ্চ শিক্ষা শেষে বিয়ে করে দেশেই থাকে। তবে রাজুর তুলনায় তার ভাইদের সন্তান সংখ্যা অনেক বেশি।

৪। রাজুর চেয়ে তার ভাইদের সন্তান সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কী।
ক. উন্নত স্বাস্থ্য সেবা
খ. কম বয়সে বিয়ে
গ. সচেতনতার অভাব
ঘ. জলবায়ুর প্রভাব

৫। রাজুর বর্তমান বসবাসরত দেশে নিচের কোনটি ঘটে ?
ক. সম্পদের অপচয়
খ. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা
গ. সম্পদের সঠিক ব্যবহার
ঘ. ভূমির সঠিক ব্যবহার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জনাব আনিস ঢাকায় থাকতেন। একদিন পাক বাহিনী এসে তার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তখন থেকে তিনি গ্রামে গিয়ে বসবাস করে। প্রায় একই কারণে প্রতিবেশি মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত লাখ লাখ রোহিঙ্গা এখন বাংলাদেশের কক্সবাজারে বাস করে। তবে রোহিঙ্গাদের এই স্থানান্তর কক্সবাজার অঞ্চলে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

ক. সামাজিক গতিশীলতা কী?
খ. উন্নত দেশে জন্মহার কম থাকার কারণ বুঝিয়ে লেখ।
গ. গ্রামের বাড়িতে আনিসের বসবাস কোন ধরনের স্থানান্তর ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে ‘ক্ষতিকর প্রভাব’ বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের সমাজ

আমরা সুন্দর পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী জুড়ে রয়েছে মানুষ। আরও রয়েছে নানা প্রজাতির গাছপালা, জীবজন্তু ও সামুদ্রিক প্রাণী। এসব প্রাণীর মাঝে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। আদিমকালে জীবজন্তুর আক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা বিপদের সামনে মানুষ ছিল অসহায়। অস্তিত্ব রক্ষা আর জীবনযাপনের চাহিদা পূরণের জন্য তারা একে অন্যকে সহযোগিতা করার প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার ধারাকে বুঝতে সমাজ কী ও কীভাবে তা গড়ে উঠেছে- এ অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা সে সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমাজজীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর যেমন- শিকার ও খাদ্যসংগ্রহভিত্তিক, উদ্যানকৃষি, পশুপালন, কৃষিভিত্তিক, শিল্পভিত্তিক ও শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কৃষিভিত্তিক সমাজ ও আধুনিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করতে পারব;
- সমাজ বিকাশে বিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করব।

পাঠ-১ : সমাজের ধারণা

মানুষ একাকী বাস করতে চায় না। নিরাপদে ও শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সবাই মিলেমিশে দলবদ্ধভাবে বাস করে। একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার ফলে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গড়ে উঠে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক নির্ভরতার মতো বিভিন্ন সম্পর্ক। এসবই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় সমাজ।

সমাজের মধ্যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান ও সংঘ থাকে। যেমন- পরিবার, গোত্র, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি। শুধু মানুষই নয়। পশুপাখি এবং কীটপতঙ্গের মাঝেও আমরা দলবদ্ধ জীবনধারা লক্ষ করি। যেমন- হাতি দল বেঁধে একসঙ্গে চলাফেরা করতে ভালোবাসে। কোনো কাক বিপদে পড়লে দল বেঁধে সব কাক তাকে বাঁচাতে চলে আসে। মৌমাছিরা মৌচাক এবং উইপোকা ঢিপি তৈরি করে তার মাঝে সবাই মিলেমিশে থাকে।

আমরা কোনো না কোনো পরিবারে বাস করি। মা-বাবা, ভাই-বোন অথবা মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বন্ধন ও কার্যকলাপের সমন্বয়ে পরিবার গড়ে উঠে। সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার। প্রাচীন কালে সমাজ গঠনের আগে পরিবার বলতে কিছু ছিল না। মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে বাঁচতে হতো। তাই খাদ্য সংগ্রহ ও হিংস্র প্রাণীর

আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবেই মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। পরিবার থেকে গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। এভাবে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমাজের উদ্ভব হয়েছে।

সাধারণভাবে সমাজের দুইটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর প্রথমটি হচ্ছে, বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সংঘবদ্ধতার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকা। সুতরাং সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝি, যার ভিত্তিতে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে সমবেতভাবে বাস করে।

কাজ-১ : নিজ নিজ পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজের ছক তৈরি কর।
কাজ-২ : দলে ভাগ হয়ে আদিম সমাজের দলবদ্ধ কাজগুলোর অভিনয় কর।

পাঠ- ২ : সমাজ জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

মানুষের জীবন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। জীবনধারণের জন্য মানুষ যেমন পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার অনেকক্ষেত্রে পরিবেশই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য মানব সমাজের প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির উপর পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট।

নদী মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে দেয়। পৃথিবীর প্রধান সভ্যতাগুলো ছিল নদীভিত্তিক। যেমন- সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা গঙ্গা অববাহিকায় বিকাশ লাভ করেছে।

আবার কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পেশা নির্ভর করে। যেমন- খনি অঞ্চলে খনি-শ্রমিক ও শিল্প এলাকায় শিল্প-শ্রমিক বাস করে। নদীমাতৃক দেশ বলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের যানবাহন হচ্ছে নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার। আবার কোনো কোনো এলাকার যানবাহন রেলগাড়ি, বাস, রিকশা ও গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

কুটিরশিল্প বিকাশেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। নদীবহুল এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ঢাকার ডেমরায় তাঁতিরা বাস করে এবং এখানেই বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ি বোনা হয়। রাজশাহীতে রেশমি শাড়ি তৈরির জন্য বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ এ অঞ্চলে তুঁতগাছ জন্মে এবং তুঁতগাছে রেশম কীট বাসা বাঁধে।

ফরিদপুরের খেজুরগুড়, মুক্তাগাছার মণ্ডা, টাঙ্গাইলের শাড়ি, সুন্দরবনের মধু, সিলেটের শীতল পাটি প্রভৃতি ঐ সব এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁও এর বিখ্যাত মসলিন শিল্পও এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার জন্যই বিকাশ লাভ করেছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্যও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ গরম পশমি কাপড় পরে আর গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার মানুষ পরে হালকা সুতি কাপড়। যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় সেখানকার মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে কাঠ বেশি ব্যবহার করে। যেসব এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সেখানে সহজেই শিল্পায়ন ঘটে এবং নগর গড়ে উঠে। নৌ-যোগাযোগ ভালো বলে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে অনেক আগে থেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে শাড়ি, শীতলপাটি, রেশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ-৩ ও ৪ : সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর : শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ, উদ্যানকৃষি ও পশুপালন সমাজ

সমাজ পরিবর্তনশীল। আজকের দিনে আমরা বাংলাদেশের যে সমাজকে দেখছি, আগের দিনের সমাজ কিন্তু এরকম ছিল না। আজকের সমাজ দীর্ঘকালের বিকাশধারার ফল। কালে কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পুরানো সমাজ দ্রুত পরিবর্তন হয়ে একালের আধুনিক সমাজ গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমাজ আরও পরিবর্তন হবে। কালের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সমাজের পরিবর্তনকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে: (১) শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ (২) উদ্যানকৃষিভিত্তিক সমাজ (৩) পশুপালন সমাজ (৪) কৃষিভিত্তিক সমাজ (৫) শিল্পভিত্তিক সমাজ (৬) শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ

শিকার ও খাদ্যসংগ্রহভিত্তিক সমাজ হচ্ছে মানব সমাজের আদিমতম রূপ। তখন স্থায়ী কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। মানুষ গুহায় ও বনজঙ্গলে বাস করত। প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু এ সম্পদকে ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে নি। বনজঙ্গল থেকে তারা খাবার খুঁজে নিত আর শিকার করত। খাবারের খোঁজে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

ফলমূলসংগ্রহ, পশুপাখি ও মৎস্য শিকার ছিল আদিম সমাজের প্রধান কাজ। যখন শিকার মিলত তখন তারা খেতো, শিকার না মিললে উপোস থাকতে হতো। মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত আর পুরুষেরা শিকার করত। গোষ্ঠীর শক্তিশালী লোকটিকে সবাই দলপতি হিসাবে মানত। সেসময় পাথরই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। এ কারণে এ সমাজকে প্রাগৈতিহাসিক বা প্রস্তরযুগের সমাজও বলা হয়। এ সমাজের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারগুলো হচ্ছে-খাঁজকাটা বল্লম, মাছ ধরার হারপুন এবং হাড়ের সুঁই ইত্যাদি। শীত ও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গাছের ছাল ও লতাপাতা এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করত। এ সমাজের মানুষ কোনো শক্তিশালী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে নি।

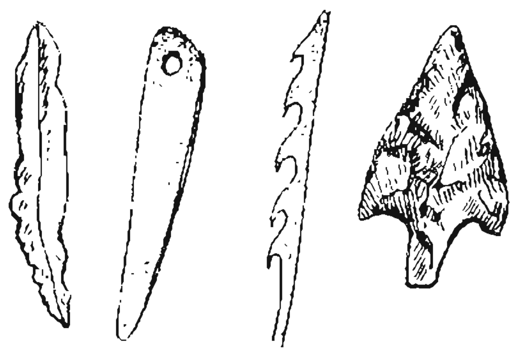

আদিম সমাজে খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার

উদ্যানকৃষিভিত্তিক সমাজ

এ সমাজে খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, মেয়েরাই কৃষি কাজের উদ্ভাবন করেছে। আদিম সমাজে পুরুষেরা যেত শিকারের সন্ধানে, ফলমূল আহরণের ভার ছিল মেয়েদের উপর। ফলমূল সংগ্রহ করতে গিয়ে কখনো তারা নিয়ে

২০২০

আসত বুনো গম ও বার্লি, মেটে আলু, কচুর মূল ও কন্দ। আস্তানার আশপাশে গম ও বার্লির যেসব দানা পড়ত তা থেকে গজিয়ে উঠত চারা গাছ। চারা গাছে পরে দেখা দিত শিষ ও দানা। এ ধরনের ঘটনা থেকে বীজ ছিটিয়ে খাওয়ার উপযোগী শস্য পাওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কৃষিকাজের এ পর্যায়কে বলা হয় উদ্যান চাষ। এক্ষেত্রে প্রথমে মেয়েরা তাদের বসবাসের আশপাশে পতিত জমিতে একটি লম্বা লাঠি বা পশুর শিং দিয়ে মাটি চিরে গর্তে বীজ ফেলে ফসল ও ফলমূল উৎপাদন করত। ফসল পাকলে পশুর চোয়ালের হাড় দিয়ে ফসল কাটত। তবে প্রয়োজনের বেশি ফসল তারা উৎপাদন করে নি।

পশুপালন সমাজ

সমাজ বিকাশের ধারায় পশুপালন শুরু হলে সমাজ আরও এগিয়ে যায়। এ সমাজের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। শিকারি মানুষ প্রথমে কুকুরকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। কুকুর ছিল বিশ্বস্ত প্রহরী ও শিকারের সঙ্গী। অনেক সময় বুনো ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশু মানুষের হাতে ধরা পড়ত। সেগুলোকে তারা ধরে এনে বেঁধে রাখত। এগুলো ছিল তাদের জীবন্ত খাদ্যভান্ডার। শিকার না মিললে এগুলোকে বধ করে আহার করত। মানুষ ক্রমে বুঝতে পারে গরু, ছাগল ভেড়াকে না মেরে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখলে বেশি লাভজনক হবে। যেমন, প্রতিদিন দুধ ও বছর বছর বাচ্চা পাওয়া যাবে, চামড়া ও পশমকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে। এভাবে সমাজে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়ে তা মানুষের সম্পদে পরিণত হয়।

এ সমাজে মুদ্রার প্রচলন হয় নি। তবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার উদ্ভব ঘটে। একজনের পশুর সঙ্গে অন্য পশু কিংবা অন্য কিছু বদল করা হতো। তবে আদিম সমাজের মতো এ সমাজের মানুষও যাযাবর জীবনযাপন করত।

পশুপালন সমাজে পশুপালন

কাজ : দলে ভাগ হয়ে উল্লিখিত তিনটি সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

পাঠ- ৫ ও ৬ : সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর: কৃষি, শিল্প ও শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ

কৃষিভিত্তিক সমাজ

কৃষিকাজের সূচনা মেয়েরা করলেও লাঙল আবিষ্কারের পর পুরুষেরা জমি চাষের দায়িত্ব নেয়। প্রথমে তারা নিজের কাঁধে জোয়াল নিয়ে জমি চাষ করা শুরু করে। কালক্রমে হালের বলদের ব্যবহার শুরু হয়। লাঙল ও হালের বলদ ব্যবহার করে চাষ শুরু হলে উৎপাদন বাড়তে থাকে। যেসব অঞ্চলে বন্যা হতো এবং জমিতে পলি পড়ত মানুষ সেসব জমিতে গম ও বার্লির বীজ ছিটিয়ে দিত। এসব অঞ্চল ছিল নীল নদের তীর, সিন্ধু উপত্যকা ও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা। সে যুগে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টি হতো। তাই কৃষিকাজ এসব অঞ্চলে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। পরে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজ প্রসারের সাথে সাথে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়।

কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন ও সভ্যতার উন্নতি হতে থাকে। কৃষিকাজের উপযোগী স্থানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানুষ স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস শুরু করে। কৃষিকাজ মানুষের খাদ্যের সংস্থান আরও নিশ্চিত করে। এ সমাজের উদ্বৃত্ত ফসল অবসর জীবনযাপনকারী শ্রেণির উদ্ভব করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে এবং নগর জীবনের বিকাশে ভূমিকা রাখে। কৃষির উদ্বৃত্ত ফসল সভ্যতার সূচনা করে। এ কারণে বলা হয়, সভ্যতা হচ্ছে কৃষির অবদান।

শিল্পভিত্তিক সমাজ

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে যায়। ইউরোপের মানুষ আবিষ্কার করে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। এটি ইউরোপের নবজাগৃতি বা রেনেসাঁ নামে পরিচিত। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ বেরিয়ে পড়ে অজানাকে জানতে, পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস পৌঁছে

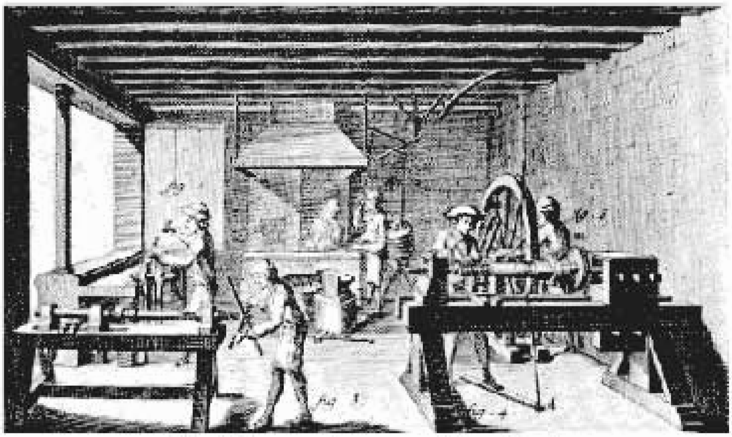

শিল্পভিত্তিক সমাজে যন্ত্রচালিত উৎপাদন

গেলেন আমেরিকায়। ১৬৮৫ সালে নিউটন তুলে ধরলেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ। এভাবে শুরু হলো একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধারণা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা পরপর আবিষ্কার করেন সুতা কাটার মাকু বা স্পিনিং মেশিন, যান্ত্রিক তাঁত, বাষ্পচালিত জাহাজ ও রেলের ইঞ্জিন। এ সময় বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়। আর স্টিম টারবাইন নামে বিশেষ ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এভাবে একদিকে বড় বড় শিল্পকারখানায় উৎপাদন শুরু হয় আর অন্যদিকে দ্রুতগামী জাহাজ ও রেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের বিস্তার ঘটে। এভাবেই সূচনা হয় শিল্পবিপ্লবের। শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল ইউরোপে, পথিকৃৎ ছিল ইংল্যান্ড।

আঠারো-উনিশ শতকে কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল ও বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। উনিশ শতকে রেল যোগাযোগ চালু হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্প কারখানার শ্রম ও কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে ইউরোপের মানুষ উপনিবেশ স্থাপন করল মূলত এশিয়া ও আফ্রিকায়। তখন থেকে বিশ্বব্যাপী শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে। বিশ শতকে শুরু হয় বিমান, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশনের ব্যবহার।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ

শিল্পভিত্তিক সমাজে শক্তির উৎস হিসাবে মানুষ ও পশুর স্থান দখল করে যন্ত্র। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য। শিল্পের বদলে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করাই হচ্ছে অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। সম্পত্তির মালিকদের বদলে পেশাজীবী, চাকরিজীবী, বিজ্ঞানী, তথ্য প্রকৌশলী এবং সেবা ও বিনোদন খাতের সাথে যুক্ত মানুষেরাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন এবং যোগাযোগের নানা মাধ্যম যেমন ফেসবুক পৃথিবীর মানুষকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বলা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন।

কাজ : দলে ভাগ হয়ে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

পাঠ-৭ : বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি

কালের অগ্রযাত্রায় আজ বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তন হয়ে আধুনিক সমাজে রূপ পেয়েছে। কুমিল্লার লালমাই, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বাঙালির প্রাচীন বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঙালির এই আদি পুরুষরাই এ অঞ্চলে কৃষির সূচনা করেছিল। তখন কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন হতো। এ উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভর করেই বিকশিত হয় আরও কিছু পেশার। যেমন- কারিগর, ব্যবসায়ী, শ্রমিক। কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করেই উদ্ভব ঘটে নানা লোকাচার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও উৎসবের। কৃষিকাজের পাশাপাশি তখন পশুশিকার ও পশুপালনও ছিল।

তবে সমাজ বিকাশের একটা স্তরে প্রবেশ করা মানেই যে পূর্ববর্তী স্তর বিলুপ্ত হয়ে যায় তা নয়। তাই বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বর্তমানে শিল্পভিত্তিক সমাজ ও শিল্পবিপ্লব-উত্তর সমাজে প্রবেশ করলেও তার পূর্ববর্তী ঐতিহ্যগুলোকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধারণ করে আছে। তাই এখনও উদ্যানকৃষি, পশুপালন, কৃষি আমাদের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। যদিও স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তানি শাসকদের অবহেলার কারণে শিল্পের বিকাশ ঘটে নি, কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার ঘটে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মতো শহরগুলোতে বড় আকারের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

তবে বর্তমানে শিল্পবিপ্লব-উত্তর যুগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের সময়ে বাংলাদেশও যোগ দিয়েছে ডিজিটাল বিপ্লবে। এখন বাংলাদেশের প্রশাসনিক, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্রই ব্যবহার হচ্ছে ইন্টারনেট, সফটওয়ার, নেটওয়ার্কিংসহ নানা মাত্রার প্রযুক্তি জ্ঞান।

কাজ-: "বাংলাদেশের সমাজ যেন মানব সমাজ বিকাশের স্তরসমূহের ধারাবাহিক ফসল"-বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. গোত্র
গ. সম্প্রদায়
খ. গোষ্ঠী
ঘ. পরিবার

২. নারীই প্রথম কৃষি কাজ শুরু করেন, কারণ তাদের ছিল -

i. সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি

ii. খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব পালন

iii. দায়িত্বপালনের বাধ্যবাধকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. i ও ii
খ. iii
ঘ. i, ii ও iii

২০২০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

স্কুল মাঠে একটি মেলা হচ্ছে। একটি স্টল স্পিনিং মেশিন, কাপড় বুননের তাঁত, বিদ্যুৎ তৈরির ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে।

৩. অনুচ্ছেদে স্টলটিতে কোন সমাজের নিদর্শন রয়েছে?

ক. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক
খ. উদ্যানকৃষিভিত্তিক
গ. কৃষিভিত্তিক
ঘ. শিল্পভিত্তিক

৪. উক্ত সমাজ ব্যবস্থার ফলে -

i. অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে
ii. কৃষির সূচনা হয়েছে
iii. যোগাযোগ সহজতর হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

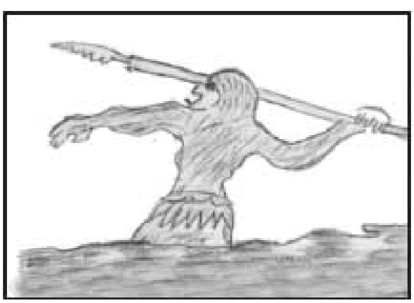

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পোড়াবাড়ি কিসের জন্য বিখ্যাত?

খ. আদিম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করত কেন?

গ. উদ্দীপকে ১নং চিত্রটি কোন সমাজের ইঙ্গিত বহন করছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২ নং চিত্রে ইঙ্গিতকারী সমাজের উদ্ভাবক মেয়েরাই-বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। এক টুকরো পাথর বা একটি গাছের ডাল হয়ে উঠেছিল হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর হাতিয়ার। প্রকৃতিকে এমনিভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। মানুষ বুঝতে পারল সমাজবদ্ধ হয়ে একত্রে থাকলে টিকে থাকার এই লড়াই আরও সুদৃঢ় হবে। তাই সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নানা নিয়ম-কানুন, যা ধীরে ধীরে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদিতে রূপ নিল। সমাজের মানুষের আনন্দ, বিনোদন ও কল্যাণের জন্য তৈরি হলো নাচ, গান, সাহিত্য আরও কত কী! ফলে রচিত হলো সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারব।

পাঠ- ১ : সংস্কৃতির ধারণা

সংস্কৃতি বা Culture যে কোনো শব্দেই তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোক না কেন, সংস্কৃতি আসলে মানুষের জীবনধারা। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সমাজজীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তা-ই তার সংস্কৃতি। যেমন, বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে। সেই খাদ্যকে যখন বিভিন্ন প্রণালিতে রান্না করে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করে তখন সেটা হয়ে যায় মানুষের সংস্কৃতি। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন প্রথম পাথরে খোদাই করে কিংবা গাছের ছাল বা পাতায় লিখত। তারপর যখন কাগজ আবিষ্কার করল তখন কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত। ধীরে ধীরে মানুষ কলম তৈরি করে কাগজের উপর লিখল। এরপর মানুষ টাইপ রাইটার আবিষ্কার করে

তার মাধ্যমে লেখা শুরু করল এবং সর্বশেষ মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করল। এখন পৃথিবীর বহু মানুষই কম্পিউটারে লেখে। এই যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যম মানুষ তৈরি করল এর সমষ্টিও সংস্কৃতির একটি অংশ।

সংস্কৃতি দুই ধরনের। একটি বস্তুগত এবং অন্যটি অবস্তুগত। বাড়ি যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে এর পরিকল্পনাটি হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি। পুস্তক যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে পুস্তক লেখক যে চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পুস্তকটি লিখেছেন তা হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং যে সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার পরিচালনা করে সেগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি।

কাজ : "আমাদের জীবনযাত্রার ধরনই হলো আমাদের সংস্কৃতি" - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান

বাংলাদেশের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, ধরতে পারি। আবার এ দেশের সংস্কৃতির অনেক উপাদানই আমরা দেখতে পাই না, ধরতেও পারি না। যেমন, বাংলাদেশের মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি আমরা দেখতে পাই; কিন্তু এগুলো তৈরির জ্ঞান ও কৌশল দেখা যায় না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ ও (২) অবস্তুগত বা অদৃশ্যমান উপাদানসমূহ।

এ দেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে- বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক, যানবাহন, খাবার, চাষাবাদের উপকরণ, বইপত্র ইত্যাদি। আমাদের সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে- সামগ্রিক জ্ঞান, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ, ভাষা, বর্ণমালা, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, আদর্শ ও মূল্যবোধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি।

আমাদের দেশের মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনেই বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছে। এসব উপাদান শত শত বছর ধরে টিকে থাকতে পারে। যেমন, আমরা জাদুঘরে গেলে এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই, যেগুলো শত বছরের পুরানো। সেগুলো দেখে আমরা বাংলাদেশের সে সময়ের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা, সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, নকশি কাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান। এর মধ্যে যখন ফুল-পাতা, হাতি-ঘোড়া বা অন্য কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয়, তখন তা হয়ে উঠে এদেশের নারী মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটির পরিবর্তনে অন্যগুলোরও পরিবর্তন হয়। যেমন, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শাড়ি একটি উপাদান। প্রযুক্তির পরিবর্তনে শাড়ির রং ও ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে। শাড়ি পরার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে।

কাজ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৩ ও ৪ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

আমাদের ভূমি যেমন উর্বর তেমনি সংস্কৃতিও বেশ সমৃদ্ধ। এখানে আগত নানা জাতের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের উর্বর ভূমি মানুষকে কৃষিজীবী হতে উৎসাহিত করেছে। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মানুষের আচার-আচরণ, সংগীত, নৃত্য, ঘরবাড়িসহ সংস্কৃতির সকল দিক। রাখালিয়া, মুর্শিদি, জারি-সারি সকল গানেই থাকত কৃষির কথা।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির ব্যবহার খুব বেশি, সেটি হাড়ি-কলসি থেকে পোড়ামাটির ফলক পর্যন্ত দেখে বেশ বোঝা যায়। এ দেশে বাঁশ, বেত, কাঠের ব্যবহার বহুকালের। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও অন্যান্য কাজে গাছপালা, জলাশয়ের অবদান বেশি। নদী-নালার সাথে নৈকট্যের কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে মাঝি, জেলে, নৌকা বানানোর কারিগর ইত্যাদি পেশা গড়ে উঠেছে। নদীভিত্তিক ভাটিয়ালি গান, সারি গান ইত্যাদিতে নদী আর নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের কথা উঠে আসে সাবলীলভাবে। কৃষক, তাঁতি, মাঝি, জেলে ছাড়া আরও রয়েছে কামার, কুমার, নাপিতসহ অসংখ্য শ্রেণি- পেশার মানুষ।

এখানে তিনটি বড় ভাষাগোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে। তারা হলো অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয়। তাদের প্রভাব আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এখনও রয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকেও আমাদের দেশে বৈচিত্র্য কম নয়। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট এবং অন্যান্য ধর্ম এখানে পালিত হচ্ছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের পাশাপাশি পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম, মুসলিম সুফি-সাধকদের মাধ্যমে ইসলামধর্ম এবং পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে এদেশে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করে। তাই আমাদের রয়েছে প্রকৃতির সাথে বসবাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য, নানা জাতের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা। এসব মিলে জনবৈচিত্র্যের মতোই বাঙালি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে লালন করে আসছে।

চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এখানে প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি তার রয়েছে ভাঙাগড়ার খামখেয়ালিপনা। একে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিরূপ আচরণে যেহেতু কখনো ঝড়, কখনো বন্যা, কখনো অনাবৃষ্টি, হঠাৎ ঢল- এসব অনিশ্চয়তা থাকে, তাই এখানকার মানুষকে পরমশক্তির প্রতি আকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত রেখেছে। সব ধর্মের মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করছে। এ সাধনার মধ্যে আল্লাহ বা ঈশ্বরের কথা যেমন আছে তেমনি আছে মানুষের কথা। বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুরটি প্রধান সেটিকে বলা হয় মানবতাবাদ। অর্থাৎ মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। এসব কথার প্রতিফলন আমরা পাই লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গানে।

সেই সুলতানি আমলে কবি চণ্ডীদাস লিখেছেন - সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর নাম না-জানা লোককবি লিখেছেন চমৎকার কবিতা- নানাবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগৎ

২০২০

ভরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন- মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু - মুসলমান। মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।

কাজ - ১ : বিভিন্ন দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর আয়োজন কর।
কাজ - ২ : বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কর।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন

সংস্কৃতি নির্মাণে ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে একেক দেশের মানুষের সংস্কৃতি একেক রকম। আবার একটি দেশের মধ্যেও নানা ধরনের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে। তাই সংস্কৃতি কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতির সবটাই বদলে যায় তা কিন্তু নয়। সংস্কৃতির কিছু প্রধান দিক দীর্ঘসময় অপরিবর্তনীয় থেকে যায়।

পেশা, লিঙ্গ, বয়স, স্থান, উৎপাদন পদ্ধতি, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে। যেমন, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামের ভৌগোলিক পরিবেশে থাকে পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ইত্যাদি। কৃষি, মৎস্যচাষ, নৌকাচালানো ইত্যাদি পেশা গ্রামের সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ এখনও গ্রামের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জারি, সারি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বারমাস্যা, গম্ভীরা ইত্যাদি নানা আঞ্চলিক গানে ফুটে উঠে গ্রামের মানুষের হাসি-কান্না। গ্রামের মেলায় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালাগান, যাত্রাগান, কবিগান, কীর্তনগান, মুর্শিদি গান প্রভৃতির আয়োজন আধুনিক কালেও গ্রামের অনন্যতা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে শহরের ভৌগোলিক পরিবেশ, পেশা, যান্ত্রিক জীবন ইত্যাদি গড়ে তুলেছে শহুরে সংস্কৃতি। বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানে প্রবেশ করেছে আধুনিক দালান-কোঠা, প্রচুর কলের গাড়ি ইত্যাদি। বিশ্বায়নের প্রভাব শহরে বেশি।

একইভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ গড়ে তোলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা। উৎসব-পার্বণ পালনে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের পোশাক, জীবনাচার, চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

আদিকাল থেকেই বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের ভাষিক সংস্কৃতি। অস্ট্রো-এশীয়, দ্রাবিড়ীয়, তিব্বতি-বর্মী, ইন্দো-ইউরোপিয়ান ইত্যাদি নানা ভাষা পরিবার মিলে তৈরি হয়েছে আমাদের ভাষা-রীতি। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকেও আমাদের ভাষা গ্রহণ করেছে অনেক শব্দ ও রীতি।

সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানবতাবাদী- যা আমরা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি। নানাভাবে এর প্রমাণ আমরা পাই। চৈত্রসংক্রান্তি মেলা যেমন আমাদের চিরায়ত কৃষি সংস্কৃতির পরিচায়ক, একইভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎসব যেমন- গারোদের ওয়ানগালা,

সাঁওতালদের সোহরাই আমাদের কৃষি সংস্কৃতির সমান অংশীদার। মণিপুরি নৃত্য, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঝুমুর নৃত্য, ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য ইত্যাদি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও ঝুমুর তালে লিখেছেন অনেক গান।

সুতরাং প্রতিনিয়ত অন্য সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে চর্চা করব এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

কাজ : দলে দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৬ : ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃতি গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। সংস্কৃতি ব্যক্তিকে রুচিশীল ও মার্জিত করে। ব্যক্তির বিকাশকে সহজ করে।

শিক্ষা যেহেতু সংস্কৃতির অংশ, তাই সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগায়। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও নিজ সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

এদেশের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। যেমন, বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রথা ও রীতি অনুযায়ী সন্তান মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখায়, দায়িত্ব পালন করে। না করলে সমাজ নিন্দা জানায়। এটি আমাদের সমাজের প্রত্যাশিত সংস্কৃতি। এভাবেই আমাদের সংস্কৃতি এদেশের মানুষের ব্যক্তিগত আচার- আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, দিক-নির্দেশনা দেয়। আবার আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও মঙ্গল চিন্তা কাজ করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি প্রধান পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে দুইটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে যে সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় সেখানে সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে দেশ ও সমাজ ভেদে সংস্কৃতির প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে।

কাজ : ধর্মীয় উৎসব কীভাবে এদেশের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে দলে ভাগ হয়ে আলোচনা কর ও উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতি?

ক. তৈজসপত্র　　গ. আচার-অনুষ্ঠান

খ. নৃত্যকলা　　ঘ. সাহিত্য

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় কারণ-

i. ধর্মের ভিন্নতা

ii. পেশার ভিন্নতা

iii. ভৌগোলিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　গ. ii ও iii

খ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের দৃশ্যকল্প দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

	ছোটদের, বড়দের, সকলের গরিবের, নিঃস্বের, ফকিরের আমারই দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের
দৃশ্যকল্প- ১	**দৃশ্যকল্প- ২**

৩. দৃশ্যকল্প-২এর মাধ্যমে সংস্কৃতির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. মানবতাবাদ　　গ. সাম্প্রদায়িকতা

খ. ধর্মবিশ্বাস　　ঘ. বর্ণবাদ

৪. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ হলো-

i. মানুষের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ

ii. একটির সাথে অপরটি সম্পর্কযুক্ত

iii. উভয়েই সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অন্তরা বাবার সাথে গ্রামে বেড়াতে যায়। তার ফুফাতো বোন জুলেখার পছন্দ সকালে পান্তাভাত ও মাছ দিয়ে নাস্তা করা ও ভাটিয়ালি গান শোনা। নাস্তায় মাছ-ভাত খেতে দিলে অন্তরার মন খারাপ হয়। কারণ তার পছন্দ বার্গার, পরোটা মাংস। কলেজে পড়াশোনা শেষে তার সময় কাটে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

ক. বস্তুগত সংস্কৃতি কী?

খ. সংস্কৃতি স্থবির বিষয় নয় বরং পরিবর্তনশীল- ব্যাখ্যা কর।

গ. জুলেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অন্তরার সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায়-মতামত দাও।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষির পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছে। দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিছু শিল্প কারখানা, রেল ও সড়ক ব্যবস্থা প্রভৃতি রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প বিকাশ লাভ করেছে, যা অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনও সেইসাথে উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া কোনো দেশ ও জাতি টিকে থাকতে পারে না। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। এ ধারা আরও বেগবান করা সম্ভব। তা করা হলে দেশ থেকে বেকারত্ব, দারিদ্র্য দূর হবে, দেশের জনগণও উন্নত জীবনযাপন করতে পারবে। এই অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা সেই বিষয়ে জানতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারব;
- গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজ বর্ণনা করতে পারব;
- শহর ও গ্রামের অর্থনীতির তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতের বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা কীভাবে সম্পদ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হব এবং নিজেকে দক্ষ সম্পদে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ১ ও ২: অর্থনৈতিক জীবনধারা

কোনো সমাজ বা জনগোষ্ঠী সাধারণত যে ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করে জীবনধারণ করে তাকেই ঐ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারা বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। জমিতে চাষ করে তারা শস্য উৎপাদন করে। তা দিয়ে নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মেটায়। উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ তারা বাজারে বিক্রি করে সেই অর্থে সংসারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটায়। বাড়তি শস্য উৎপাদন করে তারা দেশবাসীর খাদ্যের যোগান দেয়। এভাবে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। একইভাবে শহরাঞ্চলের শ্রমিক, শিল্পপতি, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক জীবনধারাও শিল্প কিংবা ব্যবসাকেন্দ্রিক।

২০২০

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এমনকি যাদের নিজস্ব জমি নেই তারাও অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ দেশের কয়েক কোটি মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সে কারণে বাংলাদেশকে কৃষিনির্ভর দেশ বলা হয়।

কৃষিকাজ ছাড়াও গ্রামের মানুষের একটা অংশ জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, মুদি হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু কিছু লোক গ্রামের হাট-বাজার বা কাছাকাছি শহরে-গঞ্জে ছোটোখাটো ব্যবসা করে। এদের সবাইকে নিয়েই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রয়েছে।

কুমার মাটির পাতিল তৈরি করছে

আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও এক সময় কৃষি ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সার, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল বীজের প্রয়োগ হচ্ছে। এর ফলে ফসলের উৎপাদনই শুধু বাড়ে নি, গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও তা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর এর প্রভাব পড়ছে।

জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরছে

তাঁতি কাপড় বুনছে

গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব

আমাদের দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশ আসে কৃষি থেকে। আর গ্রামের মানুষই এর উৎপাদক। কোনো কারণে এক বছর দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে সে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। নতুবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। দেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎসও হচ্ছে গ্রামীণ কৃষিখাত। অর্থাৎ দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও জনগণের কর্মসংস্থানের বিষয়টি অনেকাংশে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এখনও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

গ্রামের একটি হাট

বাংলাদেশের শহুরে অর্থনীতি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করে। রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় বাস করে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এসব শহর ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে বসবাসকারী মানুষ সাধারণত অফিস-আদালত ও শিল্প-কারখানায় চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন চালনা, নানা ধরনের দিনমজুরি ও বাসাবাড়িতে সহায়তাকারী হিসাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ধনী তারা নগরীর অভিজাত এলাকায় বাস করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব

বা ভাড়া বাসায় থাকে। এছাড়া বিশালসংখ্যক মানুষ বস্তি এলাকায় বাস করে। বড় বড় শহরগুলোতে ভাসমান মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তারা অস্থায়ীভাবে ফুটপাত, পার্ক, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট ইত্যাদিতে রাত কাটায়। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকেও কোনো না কোনো জীবিকা অবলম্বন করতে হয়। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক, দিনমজুর, বস্তিবাসী সবাই মিলেই শহরের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখে।

শহরের গার্মেন্টস কারখানা

শহুরে অর্থনীতির গুরুত্ব

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে আজ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবনধারার পার্থক্য কিছুটা কমে আসছে। বাড়ছে গ্রাম ও শহরের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা। লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শহরের উপর নির্ভরশীল। নগর জীবনের বিস্তার, শিল্পায়ন ও কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহুলোক শহরে আসে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শহুরে জনগণের ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কাজ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজের গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের অর্থনীতিরও প্রধান খাতগুলো হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবাখাত। তবে এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ একটা বড় ভূমিকা রাখে।

২০২১

ক. **কৃষি :** প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের অর্থনীতিতে কৃষি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান, পাট, চা, ডাল, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন; বনজ সম্পদ, পশুপালন ও মৎস্যচাষকে কৃষিখাতের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান প্রায় ২০ শতাংশ।

খ. **শিল্প :** কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খনিজসম্পদ, দালানকোঠা বা অবকাঠামো নির্মাণ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পসামগ্রী হলো পাট ও চামড়াজাত দ্রব্য, সুতা ও কাপড়। এছাড়া রয়েছে কাগজের কল, পোশাক শিল্প, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, চিনি কল ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য শিল্প, পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি। যে দেশ যত উন্নত তার অর্থনীতিতে শিল্পখাতের ভূমিকা তত গুরুত্বপূর্ণ।

গ. **ব্যবসা-বাণিজ্য :** অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যও আমাদের অর্থনীতির একটি প্রধান খাত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে দেশের ভিতরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জিনিসপত্র কেনাবেচাকে বোঝায়। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে আমরা যেমন কিছু পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করি, তেমনি যেসব পণ্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার একটি অংশ বিদেশে রপ্তানিও করি। এভাবে রপ্তানিকৃত পণ্য থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

ঘ. **সেবাখাত :** যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে সেবাখাত একটি বড় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমা, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এগুলো হলো সেবাখাতের উদাহরণ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই এই খাতটি পরিচালিত হয়। যে দেশ যত উন্নত এবং জনগণের কল্যাণকে যত বেশি গুরুত্ব দেয়, সেখানে এই সেবাখাতটি ততই শক্তিশালী।

অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান

আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও সেবা এই খাতগুলোর কোনোটির গুরুত্ব অন্যটির চেয়ে কম নয়। কৃষিখাত দেশের মানুষের খাদ্য-চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। শিল্পখাত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, আবাসন প্রভৃতির চাহিদা মেটানো ছাড়াও নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যবসা খাত অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য-সামগ্রীকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। সেবাখাত দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য কাজ করে। আজকের বিশ্বে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হলেও, কৃষিখাতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। বর্তমানে খুব প্রয়োজনের সময়ও বিশ্ববাজার

২০২০

থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খাদ্যশস্যের দামও খুব চড়া। এ অবস্থায় আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার জন্য আমাদেরকে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে আমরা কৃষি উৎপাদনকে কয়েকগুণ বাড়াতে পারি। সরকারও কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করছে। দেশে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে এসব কৃষি উপকরণ আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রা ও সচেতনতার মান বাড়িয়ে তুলতে পারলে জাতীয় অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়বে। দক্ষ জনশক্তির অভাব পূরণ হবে। জনসংখ্যাকে প্রকৃত জনসম্পদে পরিণত করা যাবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে চাকরি এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যও করছে। উপার্জিত অর্থ নিয়মিত দেশে পাঠাচ্ছে। প্রবাসীদের পাঠানো এই অর্থ কেবল তাদের পরিবার-পরিজনেরই ভাগ্য ফেরাচ্ছে না, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নেও বিরাট অবদান রাখছে।

কাজ - ১ : বাংলাদেশের সেবাখাতের একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ - ২ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গুরুত্ব তুলে ধর।

পাঠ- ৪ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার পর অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও উন্নয়নের পথে কতগুলো বাধা বা সমস্যা রয়েছে। যেমন, জনগণের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। অন্যদিকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের চমৎকার সম্ভাবনাও আছে। যার মধ্যে প্রধান হলো আমাদের বিরাট জনশক্তি ও উর্বর ভূমি। উন্নয়নের পথে আমাদের সমস্যাগুলোকে ঠিকভাবে চিনে তা সমাধান করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্য-আয়ের দেশগুলোর একটিতে পরিণত হবে। কোনো খনিজ বা প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে- যেমন জাপান, সিঙ্গাপুর। সেদিক থেকে আমরা অনেক ভাগ্যবান। আমাদের মাটি, পানি ও বিরাট জনশক্তি উন্নয়নের পথে একটি বড় সহায়। আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রমী। আমাদের দেশের প্রবাসী শ্রমিকেরা বিদেশের মাটিতে তার প্রমাণ দিচ্ছে। গার্মেন্টস বা পোশাক-শিল্পে বাংলাদেশ যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাও উন্নয়নের পথে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে।

উন্নয়নের পথ

ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে তার জন্য দরকার শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। বিশাল জনসংখ্যার দেশ আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের শিক্ষার হার কম। শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের অনেক মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। দেশের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা তাদের জীবনমান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে পারি। সেই সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের বিরাট জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি।

খ. কৃষির উন্নতি

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি এখনও উন্নয়নের প্রধান খাত। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের দ্বারা আমরা আমাদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারি। এতে আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

কয়লা, গ্যাস, তেল প্রভৃতি যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও আমাদের দেশে অব্যবহৃত রয়েছে তা উত্তোলন ও ব্যবহার করতে হবে। এতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়বে।

ঘ. শিল্পের প্রসার

গার্মেন্টস, ঔষধ, সিমেন্ট, সিরামিকসহ দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতকে সম্প্রসারণ করতে হবে। যাতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য আমরা আরও অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। তাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বাড়বে ও অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

ঙ. অবকাঠামো নির্মাণ

সড়ক, সেতু, রেলপথ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বা সম্প্রসারণ করতে হবে। তা না হলে শিল্প বা কৃষি, বাণিজ্য বা সেবা কোনো ক্ষেত্রেই একটি দেশ উন্নতি করতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত হিসাবে এই অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিকে তাই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

চ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। যাঁরা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও যাঁরা তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন তাঁদের সবাইকে এ ব্যাপারে দেশের স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

২০২০

পাঠ-৫ : উন্নয়নের পূর্বশর্ত : দক্ষ জনশক্তি

মানবসম্পদ

অদক্ষ মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো কাজে আসে না। অন্যদিকে দক্ষ মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে সফল হয়, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেও গতিশীল করতে পারে। দক্ষ মানুষ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে অদক্ষ মানুষ গণ্য হয় রাষ্ট্রের বোঝা হিসাবে। দক্ষ মানুষকেই মানবসম্পদ বলা হয়। কেননা এ ধরনের মানুষ তার দক্ষতা দিয়ে সম্পদ আহরণ বা উৎপাদন করতে পারে। এটিই হচ্ছে মানুষের উৎপাদনশীলতা। ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে দেশ তত বেশি উৎপাদনশীল হবে। মানবসম্পদ ও অদক্ষ জনশক্তির একটি তুলনা দেওয়া হলো।

চীন দেশে ১৩৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ বাস করে (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট-২০১৫)। চীনে প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে চীনের প্রতিটি মানুষ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে। চীনারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় চীনের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

জনগণ কোনো দেশের জন্য সম্পদ না হয়ে সমস্যা হতে পারে এমন উদাহরণও পৃথিবীতে রয়েছে। যেমন- আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশ ভৌগোলিকভাবে বেশ বড়, তাদের জনসংখ্যাও খুব বেশি নয়। তারপরও দেশগুলো দরিদ্র দেশ হিসাবে পরিচিত। যেমন- মালি, শাদ, সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, নাইজার প্রভৃতি।

জনসমষ্টিকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়

মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

ক. মানসম্পন্ন শিক্ষা ও কর্মমুখীশিক্ষা প্রদান,

খ. প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগে সহায়তাদান,

গ. পেশাগত প্রশিক্ষণ দান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান,

ঘ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান,

ঙ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে মূলধন খাটানোর কৌশল শিক্ষাদান,

চ. উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা,

ছ. উন্নত স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান,

জ. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা ঠিকভাবে কার্যকর করা গেলে দেশের শতভাগ মানুষ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে। আর শতভাগ দক্ষ জনশক্তি নিয়ে কোনো দেশ দরিদ্র থাকতে পারে না। সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

মানবসম্পদ সৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও জনগণের ভূমিকা

মানুষ আপনা-আপনি জনসম্পদে পরিণত হতে পারে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি বড় ভূমিকা আছে। রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করলে জনগণকে তা কাজে লাগাতে এগিয়ে আসতে হবে।

ক. রাষ্ট্রের ভূমিকা

জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকাটি আসলে রাষ্ট্রকেই নিতে হয়। আধুনিক যুগে যেসব রাষ্ট্র জনগণের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের দায়িত্ব পালন করেছে সেসব রাষ্ট্রের জনগণ দ্রুত মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। সেসব দেশ দ্রুত উন্নতিও লাভ করেছে। যেসব রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে সেসব রাষ্ট্রের জনগণ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে জনগণের উক্ত পাঁচটি মৌলিক চাহিদা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিজেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. জনগণের ভূমিকা

আমাদের সম্পদ সীমিত। তাই রাষ্ট্রের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ সকল চাহিদা পূরণ করা কঠিন। তবে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও জনগণের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্র নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। জনগণকে এসব সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে নিজেদেরকে মানবসম্পদ রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে।

কাজ : জনগণকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎস কোনটি?

ক. কৃষিখাত   গ. আমদানিখাত

খ. শিল্পখাত   ঘ. সেবাখাত

২০২০

২. শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখে -

i. ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী

ii. চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত ও পেশাজীবী

iii. নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও দিনমজুর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সিরাজগঞ্জের সবজি চাষি বিমল মিত্র তার উৎপাদিত কাঁচা সবজি গ্রামেই বিক্রি করত। গ্রামে তেমন চাহিদা না থাকায় কমদামে বিক্রি করতে হতো। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর এখন প্রায় সে প্রতিদিন ঢাকায় এসে সবজি বিক্রি করায় তার আয় তিনগুণ বেড়ে যায়।

৩. বিমল মিত্রের আয় বৃদ্ধির মূল কারণ কী-

ক. অবকাঠামোগত নির্মাণ
খ. কৃষির আধুনিকীকরণ
গ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ঘ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৪. উক্ত নির্মাণের ফলে সংগঠিত হচ্ছে-

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ii. শিল্পের প্রসার

iii. বাজার সম্প্রসারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আশরাফ আলী তার কারখানায় পশুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ তৈরি করেন। প্রথম বছরে ইংল্যান্ডে তার তৈরি ব্যাগ স্বল্প পরিমাণে বিক্রি হলেও তিন বছর শেষে ইউরোপের কয়েকটি দেশে তার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে তার স্ত্রী মিসেস জমিলা প্রতিদিন বাড়ির আঙ্গিনার হাঁস ও মুরগির খামার থেকে প্রায় শতাধিক ডিম বাজারে বিক্রি করেন। দুইজনের যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের সুখের সংসার।

ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ শহরাঞ্চলে বাস করে?

খ. বাংলাদেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয় কেন?

গ. মিসেস জমিলার কাজটি অর্থনীতির কোন খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আশরাফ আলী ও মিসেস জমিলার কাজের মধ্যে কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক সহায়ক বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. মধ্যবিত্ত লোকমান সাহেবের চার ছেলের সবাই বেকার। বড় ছেলে আরমানকে ধার দেনা করে সৌদি আরব পাঠানোর পর সে একটি খেজুর বাগানে কাজ পেল। সেখানে মরুভূমির অনুর্বর জমিতে মেধা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে খেজুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়। নিজ দেশের অনুন্নত কৃষির কথা চিন্তা করে পরের বছরই সে দেশে ফিরে এসে তিন ভাইকে নিয়ে খামার করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেকার তিন ভাইকে হর্টিকালচার সেন্টার থেকে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চার ভাই একত্রে একটি খামার তৈরি করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সফল ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

ক. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কত শতাংশ?

খ. সেবাখাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব আরমান সৌদি আরব থেকে ফিরে কোন অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ ‘‘জনাব লোকমানের বেকার চার পুত্রই এখন মানবসম্পদ’’ -মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক

মানুষ অনেক আগে জন্ম নিলেও প্রাচীন পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোনো নাগরিকত্বের ধারণা। সময়ের পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে ৫ থেকে ৬ হাজার বছর আগে নদী ও সমুদ্রের তীরে প্রাচীন কিছু নগররাষ্ট্র গড়ে উঠে। নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। ধীরে ধীরে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় সাত শ' কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার সবাই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা নাগরিক। যেমন, আমরা সবাই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং নাগরিক। রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়, কীভাবে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়, নাগরিক বলতে কী বোঝায়, কীভাবে একটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করা যায়-এ অধ্যায় পাঠে এ সম্পর্কে আমরা জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশ কেন একটি রাষ্ট্র তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন দেশের নাগরিকতা অর্জন পদ্ধতির তুলনা করতে পারব;
- দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দেশের উন্নয়নে নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করব।

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংগঠন যার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। তাহলে বলা যায়, রাষ্ট্র গঠনে চারটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। যে কোনো একটি উপাদানের অভাবে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

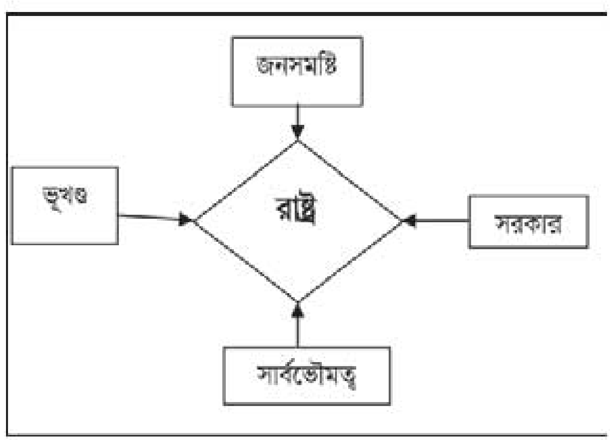

১. জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হলো জনসমষ্টি। জনগণ হলো রাষ্ট্রের প্রাণ। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। যেমন- চীনের জনসংখ্যা ১৩৭ কোটি ২০ লক্ষ। অন্যদিকে 'সান ম্যারিনো' নামের একটি ছোট দেশের জনসংখ্যা ত্রিশ হাজার মাত্র (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট-২০১৫)।

২. ভূখণ্ড : রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। ভূখণ্ড বলতে জল, স্থল ও তার উপরিস্থিত আকাশসীমাকে বোঝায়। তবে ভূখণ্ডের আয়তন কতটুকু হবে তার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আয়তনে অনেক বড় হতে পারে। আবার অনেক ছোটোও হতে পারে। যেমন- ভারতের আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান সিটির আয়তন যথাক্রমে প্রায় ৬৯৩ বর্গকিলোমিটার ও ০.১৮ বর্গকিলোমিটার। সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

৩. সরকার : রাষ্ট্র গঠনের আরেকটি অন্যতম উপাদান হলো সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং আইন অনুযায়ী জনগণকে পরিচালনা করে। জনগণ সরকারের সকল বৈধ আদেশ মেনে চলে এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

৪. সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ, চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে যে কাউকে যেকোনো নির্দেশ দিতে পারে। তাকে সে আদেশ পালনে বাধ্য করতে পারে। সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র অন্য কোনো দেশ বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বময় ক্ষমতা।

কাজ : ঢাকা ও লন্ডনকে রাষ্ট্র বলা যাবে কি না সহপাঠীদের সঙ্গে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ- ২ : রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব উপাদান দরকার তার সবগুলোই বাংলাদেশের রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা জেনে নিই।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী

জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল। এর সংখ্যা বর্তমানে ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন (সূত্র: আদম শুমারি, ২০১১)। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শিশু। এরা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

২০২০

ভূখণ্ড

বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা এ ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি। উত্তরে ভারত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ড বিস্তৃত। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বিল, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি ও বিস্তৃত সমভূমি নিয়ে এ ভূখণ্ড গঠিত। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

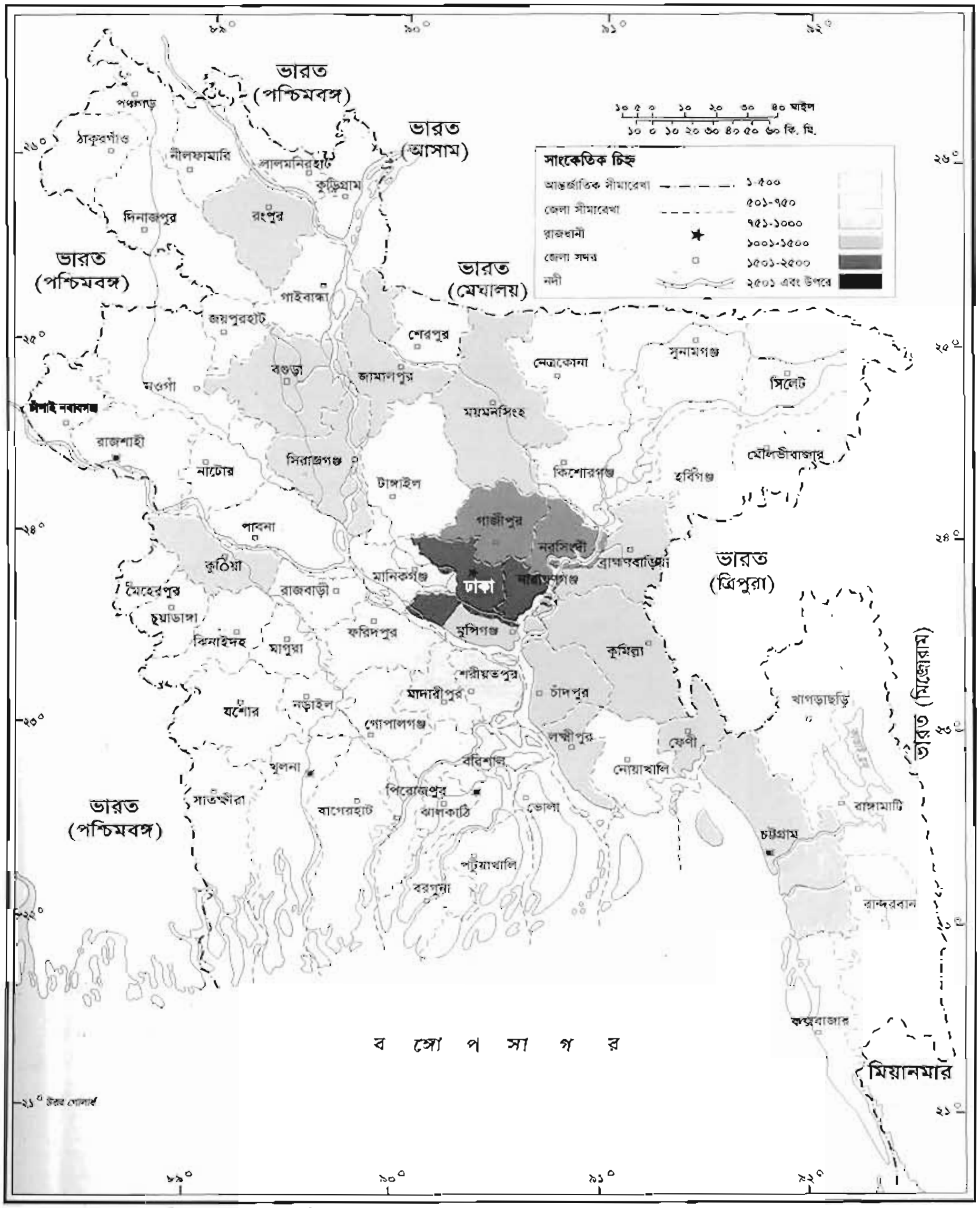

বাংলাদেশের মানচিত্র

সরকার

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। এর নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার। এ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকারের সকল নিয়ম-কানুন ও আদেশ- নিষেধ জনগণ মেনে চলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার, যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত।

সার্বভৌমত্ব

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে অবস্থান করে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও অন্য দেশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে দেশ শাসন করে। এ কারণেই অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

উপরের আলোচনায় আমরা জেনেছি, রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের রয়েছে। এর রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা, সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, গণতান্ত্রিক সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা।

কাজ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী, ভূখণ্ড ও সরকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ-৩ : নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণা

রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অধিবাসীকে বলা হয় নাগরিক। পূর্বে নগরে বসবাসকারীকে নাগরিক বলা হতো। তখন ছোট ছোট নগরকে কেন্দ্র করে গঠিত হতো রাষ্ট্র। এ নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরাই নাগরিক বলে গণ্য হতেন।

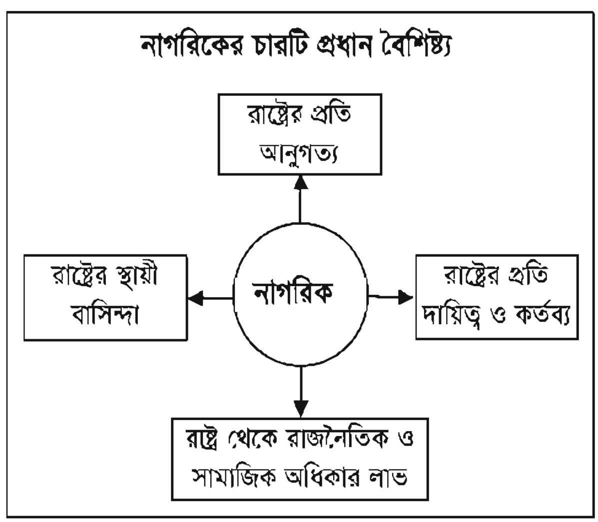

কিন্তু বর্তমানে নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণাও বদলে গেছে। এখন রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে যে কোনো ব্যক্তিই নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হবে, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে, রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করবে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের একদিকে যেমন রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অন্যদিকে তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

একজন নাগরিক রাষ্ট্রের পরিচয়েই নাগরিকত্ব পায়। বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের সকলের নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশি। আমাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।

নাগরিক ও বিদেশি

একটি রাষ্ট্রে নিজ দেশের অধিবাসী ছাড়া ভিন্ন দেশের অনেক লোকও বাস করে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি নানা কারণে তারা অবস্থান করে। এরা বিদেশি হিসাবে পরিচিত। তবে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। বিদেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে না। কেবল বসবাসকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামাজিক অধিকার ভোগ করে, কিন্তু তারা বিদেশে বসবাসকারী দেশের সরকারের কিংবা রাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাই বিদেশিরা রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।

কাজ : নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত কর।

পাঠ-৪ : নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম

নাগরিকত্ব হলো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি এ পরিচয় লাভ করে। নাগরিকত্ব লাভের দুইটি প্রধান উপায় হলো :

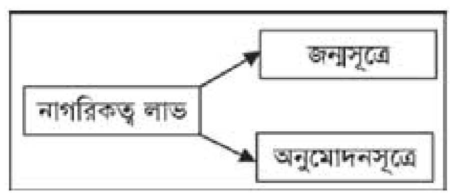

১. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

২. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

যারা জন্মসূত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা জন্মসূত্রে নাগরিক। আর যারা আবেদনের মাধ্যমে কোনো দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা অনুমোদনসূত্রে নাগরিক। তবে অনুমোদনসূত্রে যারা নাগরিকত্ব লাভ করে তাদেরকে রাষ্ট্রের আরোপিত কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো :

১. জন্মসূত্র নীতি ও ২. জন্মস্থান নীতি

জন্মসূত্র নীতি

এ নীতি অনুযায়ী মা-বাবা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান সে রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। কোনো মা-বাবার সন্তান বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও সে সন্তান মা-বাবার দেশের নাগরিক হবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এ নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী, কোনো জাপানি বা ফরাসি মা-বাবার সন্তান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও তারা জাপান বা ফ্রান্সের নাগরিক হবে। এভাবে বাংলাদেশি বা ২০২০

ভারতীয় কোনো মা-বাবার সন্তান ঐসব দেশে জন্মগ্রহণ করলে তারা বাংলাদেশ বা ভারতের নাগরিক হবে।

জন্মস্থান নীতি

এ নীতি অনুযায়ী, মা-বাবা যে দেশেরই হোক না কেন সন্তান যে দেশে জন্মগ্রহণ করবে সন্তান সে দেশের নাগরিক হবে। এ নীতি জন্মস্থানের উপর নির্ভর করে। এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মা-বাবার কোনো সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিক হবে এবং সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে। শুধু তা-ই নয়, এ নীতি অনুসরণকারী দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলেও সে সেই দেশের নাগরিক হবে। তবে বিশ্বের খুব কম সংখ্যক রাষ্ট্র এ নীতি অনুসরণ করে।

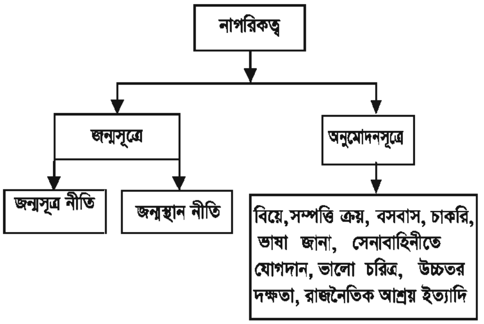

নাগরিকত্ব অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

এ পদ্ধতিতে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। এখন এক রাষ্ট্রের নাগরিক সহজেই অন্য একটি বা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হচ্ছে। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও নানা কারণে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশে বসবাস করতে হয়। এরূপ বসবাসকারী ব্যক্তির ঐ দেশের নাগরিকত্বের প্রয়োজন হয়। তখন রাষ্ট্রের কাছে ঐ ব্যক্তি আবেদন করে। আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করে। নাগরিকত্ব লাভের পর ঐ ব্যক্তি সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের কিছু শর্ত আছে। কোনো ব্যক্তি অনুমোদনসূত্রে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে যদি সে-

১. ঐ রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করে,
২. ঐ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ক্রয় করে,
৩. ঐ রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে,
৪. ঐ রাষ্ট্রে চাকরিরত থাকে,
৫. ঐ রাষ্ট্রের ভাষা জানে,
৬. ঐ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করে,
৭. ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়,
৮. উন্নততর দক্ষতার অধিকারী হয়,
৯. রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভকারী ব্যক্তি উল্লিখিত শর্তগুলোর এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করলে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। ঐ দেশের নাগরিকদের মতো প্রায় সমান অধিকারের সুযোগ-সুবিধা সে প্রাপ্য হবে।

দ্বি-নাগরিকত্ব

একই ব্যক্তি দুইটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করলে তাকে দ্বি-নাগরিকত্ব বলে। কোনো বাংলাদেশি মা-বাবার সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে স্বাভাবিক নিয়মে ঐ দেশের নাগরিক হয়। অন্যদিকে মা-বাবা বাংলাদেশি হওয়ায় সে বাংলাদেশেরও নাগরিক। এ ক্ষেত্রে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ইচ্ছা করলে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। তবে ইচ্ছা করলে সে দুইটি রাষ্ট্রেরই নাগরিকত্ব রাখতে পারে।

কাজ- ১ : দলে ভাগ হয়ে নাগরিকত্ব লাভের নিয়মগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : আমেরিকা, কানাডা, বাংলাদেশ ও ভারতে কী ধরনের নাগরিকত্ব রয়েছে?

পাঠ-৫ : দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা

রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র আছে বলেই সেখানে নাগরিক আছে। আবার নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিক হলে সে সুনাগরিক বলে বিবেচিত হয়। তার দ্বারা দেশের অধিক উন্নয়ন সাধন হয়। একজন সুনাগরিক বুদ্ধিমান, বিবেকবান, আত্মসংযমী এবং নিবেদিত হয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সকল নাগরিকই সুনাগরিকের গুণ অর্জন করতে পারে না। কাজেই বলা যায়, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সুনাগরিক না হলেও সকল সুনাগরিকই নাগরিক।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা অধিকার ভোগ করি। বিনিময়ে নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, ভোট প্রদান করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা ও সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ ভোট দিয়ে একটি দলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠনে সহায়তা করে। সরকার যদি দেশের জন্য কল্যাণকর নয় এমন কোনো কাজ করে তাহলে জনগণই পরবর্তী সময়ে ঐ দলকে আর ভোট দেয় না। রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নসহ সবকিছুই তাই নির্ভর করে নাগরিকের সততা, দক্ষতা তথা নাগরিক হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপর। দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয়। নাগরিকদেরও নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তাহলেই দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজ : নাগরিক হিসাবে তুমি দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মূল অধিকারী কে?

ক. জনগণ
গ. রাষ্ট্র
খ. সরকার
ঘ. সমাজ

২. রাষ্ট্রের জন্য সরকারের অপরিহার্যতা –

i. দেশ পরিচালনায়

ii. জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায়

iii. দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. ii ও iii
খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

‘ক’ রাষ্ট্রে নিজের দেশের নাগরিক ছাড়াও অন্যান্য দেশের লোক বাস করে। হঠাৎ ‘খ’ রাষ্ট্রের সাথে ‘ক’ রাষ্ট্রের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের লোক নিজ দেশে চলে গেল কিন্তু ‘ক’ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সরকারের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। যুদ্ধে ‘খ’ রাষ্ট্র ‘ক’ রাষ্ট্রকে দখল করে নিল।

৩. ‘ক’ রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের নাগরিকদের চলে যাওয়ার কারণ-

i. তারা ‘ক’ রাষ্ট্রের নাগরিক নয়

ii. ‘ক’ রাষ্ট্র তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারে না

iii. তারা ‘ক’ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. iii
খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. 'খ' রাষ্ট্র কর্তৃক 'ক' রাষ্ট্র দখল করে নেওয়ায় 'ক' রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি বিলুপ্ত হলো-

ক. জনসমষ্টি
গ. ভূখণ্ড
খ. সরকার
ঘ. সার্বভৌমত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাকির সাহেব ও আফরিন দম্পতি চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরের অধিক সময় ধরে বসবাস করছেন। সেখানে তাদের ছেলে স্বননের জন্ম হয়। তারা সেখানে নিজেদের আয় থেকে একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ক্রয় করেন। সরকারকে নিয়মিত আয়কর দেন। দেশের আইনকানুন মেনে চলেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি তহবিল পরিচালনা করেন। এই দম্পতি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ক. নাগরিক কিসের পরিচয়ে নাগরিকত্ব লাভ করে?
খ. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই নাগরিক নয় কেন?
গ. জাকির সাহেবের নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জাকির সাহেব ও স্বননের নাগরিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলাদেশের অধিবাসী সজীব সিঙ্গাপুরে মেরিন সার্ভিসে কর্মরত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান মেয়েকে তিন বছর হয় বিয়ে করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকার একটি জাহাজে করে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পূর্বেই জাহাজে তাদের মেয়ে মারিয়ার জন্ম হয়। বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা সজীবের ছোট ভাই সাগর গত নির্বাচনে সেখানে ভোট দিতে পারে নি।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার কখন গঠিত হয়?
খ. দ্বি-নাগরিকত্ব বলতে কী বোঝায়?
গ. মারিয়া কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সজীব বা সাগরের নাগরিক অধিকার ভিন্ন'- উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিবেশ

মানুষ নিজস্ব পরিবেশে বাস করে। পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আমাদের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধে অনেক কিছু করণীয় আছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব;
- পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হব।

পাঠ-১ : মানুষ ও পরিবেশ

মানুষ নিজস্ব পরিবেশে জীবনযাপন করে। তার জীবন পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃতির চারটি মূল উপাদান হলো- মাটি, পানি, বায়ু এবং আলো। আলো ও তাপের প্রধান উৎস হলো সূর্য। মাটির উপর জন্মানো গাছপালা পানি, বায়ু, তাপ ও আলোর সাহায্যে বেড়ে উঠে। এসবের উপর নির্ভর করেই এ পৃথিবীতে মানুষের বসতি সম্ভব হয়েছে।

সৃষ্টির শুরুতে মানুষ প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকেই সে সবকিছু সংগ্রহ করেছে। ঘরবাড়ি তৈরিতে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করেছে। মাটিকে সে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। মাটির বাড়া-কমা নেই, কিন্তু ক্ষয় আছে, তাতে যে খনিজসম্পদ থাকে সেগুলো হ্রাস পায়। বাকি তিনটি অর্থাৎ পানি, বাতাস ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, খরায় আমরা এ সমস্যা টের পাই।

মানুষ যখন থেকে চাষবাস করে স্থিতিবস্থায় এসেছে, তখন থেকেই প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে। বনবাদাড় সাফ করে বড় এলাকা জুড়ে ফসলের ক্ষেত করেছে। ধান, গম, ভুট্টা আরও অনেক ফসল উৎপাদন করেছে। কিছু পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে। বন্য-পশুর মধ্যে

২০২০

কোনোটিকে মেরে রান্না করে খেতে শিখেছে। আবার কোনোটিকে মেরে হয়তো চামড়াটি কাজে লাগিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র পশুকে হত্যাও করেছে। নিজের প্রয়োজনে আবার মানুষ কিছু গাছপালা রোপণ করেছে, যা তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

কাজ - ১ : প্রকৃতির মূল উপাদানগুলোকে চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : মানুষ ও পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ-২ ও ৩ : পরিবেশগত সমস্যা : কারণ ও প্রভাব

মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধি খাটিয়ে নদীতে বাধ দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। পানির শক্তি কাজে লাগিয়ে কল চালিয়েছে। এভাবে ক্রমেই তার প্রয়োজন মতো সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছে। বড় বড় কলকারখানা বানিয়েছে, শহর গড়েছে, গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন চালাচ্ছে। শীতাতপ যন্ত্র বানিয়ে নিজের আরাম বাড়িয়েছে। এসব মিলিয়ে নানা রকম শব্দও বাড়ছে। শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মানুষ বাড়তে থাকায়, আর সবার মধ্যে ভালো ও আরামে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় পরিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। বলা যায়, মাটি, পানি, বায়ু ও তাপের সাথে মানুষের জীবনযাপনের যে ভারসাম্য থাকা দরকার ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে। দূষণের কারণে ঢাকা শহরের অসংখ্য শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে। তাছাড়া হৃদরোগ, ক্যানসার, চর্মরোগ, নানা ধরনের অ্যালার্জি বাড়ছে।

ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চাপ দেশের নগরগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থানসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। ফলে নগরে বস্তির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বসতি ও শিল্প-কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনে দেশের অনেক জলাভূমি ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো কখনো শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে মিশ্রিত হয়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে জলজ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে এবং পাহাড়ের পাদদেশে ঘরবাড়ি নির্মাণের কারণে পাহাড় কাটা হয়। এছাড়া অনেক সময় ইটের ভাটার জন্যও পাহাড় কাটা হয়। এগুলো সবই পরিবেশগত সমস্যার কারণ। পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানের বাহুল্যতার কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এতে উপকূলীয় এলাকার অনেকে গৃহহীন হয়ে পরিবেশগত উদ্বাস্তু হয়ে যায়।

একই জমি বারবার চাষ হওয়ার ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে। এখন মানুষ ভূমিতে জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক সার দিচ্ছে। সার তৈরি এবং কাপড়, ঔষধ, নানা সরঞ্জামসহ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেড়ে চলেছে কারখানা। এগুলো থেকে কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আর যে বর্জ্য বেরিয়ে আসছে তা পানি ও বায়ুকে দূষিত করছে। তাছাড়া এর প্রভাবে তাপমাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। তাপ বেড়ে যাওয়ায় আবহাওয়া ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এর ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়, বন্যা হচ্ছে।

আবার মানুষ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গাছপালা কাটা পড়ছে, প্রাকৃতিক বন উজাড় হচ্ছে। তাতে ভূমিক্ষয় আর তাপবৃদ্ধি ঠেকানো যাচ্ছে না। এমনকি এসবের ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুণি-রশ্মি ঠেকানোর জন্য পৃথিবীর মহাকাশে যে ওজোন স্তর আছে তাও ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশগত সমস্যাঃ বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, পানি দূষণ

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের অফুরন্ত উৎস গাছপালা। নির্বিচারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে বাতাসে প্রত্যাশিত অক্সিজেনের পরিমাণ। ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানি ইত্যাদির যোগান। বাতাসে অক্সিজেনের ভারসাম্য কমায় স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী নানা গ্যাসের পরিমাণ।

আমাদের আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করতে একইভাবে আমরা নিঃশেষ করে চলেছি খনিজসম্পদ, পশু-পাখি, নদী-নালাসহ প্রকৃতির নানা উপাদান। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অনেক প্রজাতি যা কোনো না কোনোভাবে আমাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে সহায়তা করত।

ক্রমাগত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তাতে সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কাজ-১ : মানুষ পরিবেশগত সমস্যা ও এর ক্ষতিকর দিকসমূহ চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা কেন ভবিষ্যত প্রজন্মের উদ্বেগের কারণ-ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৪ ও ৫ : বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয়

পরিবেশগত সমস্যার কারণে বাংলাদেশের জনগণের নানা প্রকার সমস্যা হয়। এ রকম সমস্যা কি আমরা হতে দিতে পারি? এ বিষয়ে জাতিসংঘ থেকে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সবারই, এমনকি শিশুদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা-

- অযথা গাছ কাটব না।
- যেখানে-সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করব না।

- যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলব না।
- রাস্তাঘাটে থুথু, সর্দি ফেলব না।
- যেসব গাড়ি থেকে কালোধোঁয়া বের হয় সেগুলো চলাচল বন্ধ করার জন্য সচেতন করব।
- লোকালয়ের কাছে শিল্পকারখানা না গড়তে সচেতন করব।
- বাড়ির বর্জ্য যথাস্থানে ফেলব। নর্দমায় কখনো শক্ত বর্জ্য ফেলব না।
- অযথা মাইক বাজিয়ে শান্তি নষ্ট করব না।
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অফিস এলাকায় শব্দ দূষণ করব না।
- পাহাড় কাটব না।
- নদী, খাল, হ্রদ বা সমুদ্রসহ ছোটবড় কোনো জলাধারে ময়লা ফেলব না।
- বন, পাহাড়, নদীসহ কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করব না।
- গাছ লাগাব ও গাছের যত্ন নেব।
- প্রকৃতির কাছাকাছি থাকব।
- মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণগুলো জানব ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেব।
- উন্নয়নমূলক কাজে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেব।
- নিজের খাবার, পোশাক ও অন্যান্য জিনিস নির্বাচন ও ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্যের কথা বিবেচনা করব।

কাজ : প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি প্রকৃতির মূল উপাদান?

ক. গ্যাস গ. আলো

খ. বন ঘ. ফসল

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে-

i. নগরে বস্তি বৃদ্ধি পায়

ii. নদীর পানি দূষিত হয়

iii. কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

আজাদ তার গ্রামে গাছপালা কেটে এবং জলাশয় ভরাট করে একটি সাবানের কারখানা তৈরি করে। কারখানার মেশিনের শব্দে আশপাশের মানুষ অতিষ্ঠ। আজাদের চাচা চাকরি শেষে গ্রামে এসে খালি জায়গায় গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। অপরিষ্কার খালগুলো পরিষ্কার করে পানি চলাচলের ব্যবস্থা করেন।

৩. আজাদের কার্যক্রমকে কী বলা যায়?

ক. মানুষ সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা
খ. প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা
গ. প্রকৃতিকে মানুষের জয় করার চেষ্টা
ঘ. প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা

৪. আজাদের চাচার কার্যক্রমের ফলাফল কোনটি?

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে
খ. মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে
গ. মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে
ঘ. জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

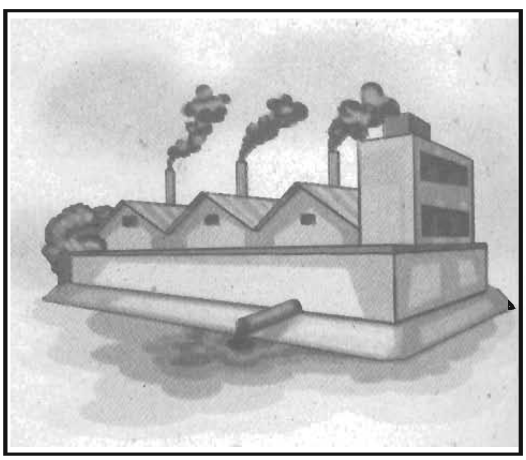

ক. আলো ও তাপের প্রধান উৎস কোনটি?
খ. মানুষ কীভাবে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. উপরের চিত্রে কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে তোমাদের মতো শিশুদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির হোসেন ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি অত্যাধুনিক ফ্লাটে বসবাস করেন। তার ছেলে-মেয়েরা বিনোদনের জন্য উচ্চ আওয়াজে গান শোনে, যা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। তার এপার্টমেন্ট ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রয়েছে নিজস্ব জেনারেটর।

ক. মানুষ কখন থেকে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে?
খ. প্রকৃতির মূল উপাদান কীভাবে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে?
গ. মনির হোসেনের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পরিবেশে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে? বর্ণনা কর।
ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তোমার কি কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশে শিশু অধিকার

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব আজকের শিশুদের উপর বর্তাবে। একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি তাদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা সর্বোপরি তাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার প্রতি গোটা বিশ্ব মনোযোগ দিয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার রক্ষার জন্য 'শিশু অধিকার সনদ' তৈরি করেছে। এর সাথে বাংলাদেশ সরকার একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

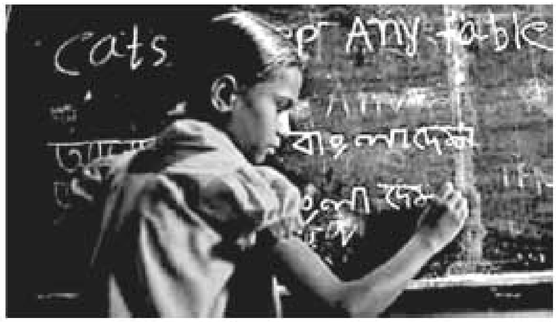

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- শিশু অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত 'শিশু অধিকার সনদ' অনুযায়ী শিশু অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারব এবং বাংলাদেশের শিশু অধিকারের বাস্তবতা তুলে ধরতে পারব;
- শিশু অধিকারের উপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব।

পাঠ-১ : শিশু অধিকার

অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সব সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অন্যদিকে, শিশু বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমাকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন সমাজে শৈশবের ধারণা বিভিন্ন রকম এবং শৈশব নির্ধারণের মানদণ্ডও ভিন্ন ভিন্ন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানুষকে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তা-ই শিশু অধিকার। সেই মানুষই যথার্থ স্বাধীন, যার জীবন ভয়ে বা নিরাপত্তাহীনতায় কাটে না; যার জীবন সবদিক থেকে নিরাপদ ও বাধাহীন। শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনগত, নাগরিক ও সামাজিক সেবা প্রদান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুর অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। সমাজের প্রতিটি শিশু বৈষম্যহীনভাবে বেড়ে উঠবে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করবে এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করবে-এগুলোই শিশু অধিকারের মূলমন্ত্র। এছাড়া স্বাধীনভাবে কথা বলা, চলাফেরা করা, মত প্রকাশ করা ইত্যাদি শিশুর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কাজেই, শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে যাবতীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কাজ : অধিকার নিয়ে ক্লাসে একটি মুক্ত আলোচনার আসর কর।

পাঠ- ২ : জাতিসংঘ স্বীকৃত শিশু অধিকার

শিশুর জীবন অনেক ব্যাপারে বড়দের উপর নির্ভরশীল। তার নিজের আয় নেই। ছোট বলে তার গায়ে শক্তি কম। একই কারণে তার জ্ঞানও কম। কিন্তু তাই বলে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তার উপর কোনো ব্যাপারে জোর খাটানো চলবে না। শিশুও কতগুলো ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। শিশু হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তারও কিছু অধিকার আছে। জাতিসংঘ বড়দের মতো শিশুদের জন্যও কতোগুলো সুনির্দিষ্ট অধিকার ঘোষণা করেছে। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে এই অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে। উক্ত সনদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হলো:

- ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানুষ শিশু। তবে কোনো কোনো দেশে এ বয়স দেশীয় আইনে আরও কম।
- সব শিশুর অধিকার সমান। অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে, ধনী-গরিব, জাতীয়তা, ধর্ম, শারীরিক সামর্থ্য কোনো কিছুতেই শিশুদের অধিকারের তারতম্য করা যাবে না।
- বাবা-মা ও বড়দের শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাদের সদুপদেশ দিতে ও পথ চলতে সাহায্য করতে হবে।
- শিশু তার নিজের ও বাবা-মার নামসহ সঠিক পরিচয় ব্যবহারের অধিকারী হবে।
- শিশুর বেঁচে থাকা ও বড় হওয়ার অধিকার রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
- মা-বাবার নির্দেশনায় শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রকাশ, বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
- মারধর কিংবা অন্যায় বকাঝকা থেকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব আছে।
- শিশুরা যাতে সময়মতো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পায় রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষাচর্চার অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- প্রতিটি শিশুর অবকাশ যাপন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অধিকার রয়েছে।
- অর্থনৈতিক শোষণ এবং যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুর বিরত থাকার অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- শিশুকে কেউ যেন অন্যায় কাজে ব্যবহার করতে না পারে। শিশুর শারীরিক-মানসিক-নৈতিক ক্ষতি যাতে না হয় রাষ্ট্রকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কোনো শিশুকে যুদ্ধে বা সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।
- শিশুর সম্মানবোধ, নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

মোটকথা, শিশুর জীবনধারণ, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিন্তা, বিবেচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি সব ধরনের অধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘ মনোযোগ প্রদান করেছে। আমরা শিশু হিসাবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানব ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করব। কেউ শিশু অধিকার বিরোধী কাজ করলে প্রয়োজনে প্রতিবাদ করব।

কাজ : শিশু অধিকারের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশে শিশু অধিকার পরিস্থিতি

১৯৯০ সালের ২৬শে জানুয়ারি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের মূল দলিলটি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হলে প্রথম দিনই বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯০ সালের ৩রা আগস্ট বাংলাদেশ এই সনদের বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার করে।

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসচেতনতা ইত্যাদির কারণে শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, কোনো কোনো সময় তারা নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকারও হয়। তাই শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও বিকাশ তথা শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি 'জাতীয় শিশু নীতি' প্রণয়ন করেছে। মাতৃপিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা কার্যক্রম, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হচ্ছে-

- শিশুর অপুষ্টি দূরীকরণ;
- সকল শিশুর স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ;
- অন্ধত্ব নির্মূল করার জন্য সকল শিশুকে বিনামূল্যে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদান;
- সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ;
- জবরদস্তিমূলক ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ;
- পথশিশু ও বিপথগামী শিশুদের বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা;
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা;
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা;
- সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান ইত্যাদি।

তবে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। সর্বোপরি শিশুদের মধ্যে শিশু অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ, সচেতনতা ও চাহিদা সৃষ্টি করতে পারা।

কাজ-১ : তোমার ক্লাসের কোনো শিক্ষার্থী যদি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু হয়, তবে তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করবে।

কাজ-২ : তোমার এলাকার শিশু অধিকার পরিস্থিতি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে কয়টি ধারা রয়েছে?

ক. ৫২ গ. ৫৪
খ. ৫৩ ঘ. ৫৫

২. 'সেই ব্যক্তি স্বাধীন যার মনে কোনো ভয় থাকে না'- কথাটির অর্থ হচ্ছে-

i. যে কাউকে ভয় পায় না
ii. যে খুব বেশি সাহসী
iii. যার জীবন নিশ্চিত ও নিরাপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii
খ. iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও -

মনোয়ারা রাস্তায় ফুল বিক্রি করে। তার গায়ে ছেড়া জামা। সে মাদ্রাসায় যায় না। তার ছোট বোনও মাদ্রাসায় যায় না। তাদের বাবা নেই। মা অন্যের বাসায় কাজ করেন। তার রোজগারে সংসার চলে। এতে তারা পেট ভরে খেতে পায় না।

৩. মনোয়ারার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা হচ্ছে -

i. অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি
ii. অবকাশ যাপন ও খেলাধুলা
iii. শিশুর বেঁচে থাকা ও বড় হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. iii
খ. ii ঘ. i, ii ও iii

৪. মনোয়ারার যে অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে তা রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব কার -

ক. সমাজের
গ. পরিবারের
খ. রাষ্ট্রের
ঘ. প্রতিবেশীর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রিফাহ ও রিমা দুই বোন। কাগজ দিয়ে তারা রোবট বানানোর চেষ্টা করছিল। তাদের মা দেখে ধমক দেন এবং জিনিসপত্রগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেন। ঠিক তখনই টিভিতে শিশু অধিকার নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান চলছিল, যা দেখে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন।

ক. শিশু কারা?
খ. 'অধিকার নিরাপত্তার অবলম্বন'- বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।
গ. রিফাহর মা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের কোন ধারাটি লঙ্ঘন করেছেন—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রিফাহর মা এর করণীয় কী ছিল, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে শিশুর বেড়ে উঠা ও প্রতিবন্ধকতা

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে একান্তই ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রাণী থাকে। ধীরে ধীরে সে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে বেড়ে উঠে। শিশুর বেড়ে উঠা শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবারের গণ্ডি পার হয়ে শিশুকে নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে হয়। নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ। তবে সমাজে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ অতি জরুরি, অন্যথায় ভীতিকর মানসিক বৈকল্য নিয়ে শিশুদেরকে বেড়ে উঠতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা সমাজে শিশুর বেড়ে উঠা ও বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারণা ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শিশুশ্রমের ধারণা, কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশুপাচারের কৌশল, কারণ এবং এর ক্ষতিকর দিক বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শিশুপাচার প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে যোগ্যতা অর্জন করব;
- শ্রমজীবী শিশুর অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে সচেতন হব।

পাঠ– ১ : সামাজিকীকরণ ও সমাজজীবনে এর প্রভাব

সমাজে আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠি। সামাজিক জীব হিসাবে পরিচিতি লাভ করি। সমাজ থেকে আমরা যা শিখি সেটা আমাদের সামাজিক শিক্ষা। এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- সমাজের নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামাজিক শিক্ষা

আয়ত্ত করে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হই তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন শিশুর প্রাথমিক অভাব পূরণ করে তার মা। এ কারণে মা শিশুর অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়। কিছুকাল পরে শিশু বাবাসহ অন্যান্য মানুষের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তার সামাজিক সম্পর্কের গণ্ডি আরও বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে শিশু প্রতিবেশী, সমবয়সী, খেলা ও পড়ার সাথি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। এভাবে শিশু আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, দায়িত্ব, কর্তব্য, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি আয়ত্ত করে সামাজিক জীব হিসাবে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত হয়।

সমাজজীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব অনেক। এ প্রক্রিয়া শিশুকে সামাজিক মানুষে পরিণত করে। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বিকশিত হতে ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শিশুকে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হতে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়া শিশুকে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতেও শেখায়। যেমন- আমাদের সমাজ প্রত্যাশা করে, নারী- পুরুষ সকলেই একে অন্যের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এ কাজে আমরা অভ্যস্ত হলে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ীই আচরণ করা হবে। সামাজিকীকরণ শিশুর জীবনে প্রয়োজনীয় দক্ষতারও বিকাশ ঘটায়। অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শিশু নিজ জীবনের অনেক ঝুঁকি ও সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে।

কাজ - ১ : শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
কাজ - ২ : সামাজিকীকরণের বাহনগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ৩ : দলে ভাগ হয়ে সমাজজীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

পাঠ- ২ ও ৩ : সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব

সামাজিকীকরণের কতিপয় মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো-

পরিবার : শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় পরিবার থেকে। শিশুর চারিত্রিক গুণাবলি পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়। সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষা শিশু পরিবার থেকে অর্জন করে। শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ। মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক মধুর হলে শিশু সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে, পারিবারিক অশান্তি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে শিশুর বেড়ে উঠার জন্য সবসময় সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখা উচিত।

প্রতিবেশী : আমাদের বাড়ির আশপাশে যারা বসবাস করেন তারা হলো আমাদের প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়িগুলোর সমবয়সী শিশুদের নিয়ে একটি প্রতিবেশী দল গড়ে উঠতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমতা, ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্জন করতে পারি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি কতগুলো সামাজিক আদর্শও শিখে থাকে। এসব আদর্শ হচ্ছে-শৃঙ্খলাবোধ, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে শিশু বৃহত্তর সমাজের আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধও শিখে থাকে। শিশুর সুঅভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুও শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। সামাজিকীকরণে তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খেলা ও পড়ার সাথি : শিশুর সামাজিকীকরণে খেলা ও পড়ার সাথির ভূমিকা কম নয়। শিশু খেলা ও পড়ার সাথির সাথে মেলামেশা করে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারে। ভালো-মন্দ গুণাবলির সমালোচনা শুনে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে। তবে মন্দ খেলা ও পড়ার সাথি অনেক সময় শিশুকে বিপথগামী করতে পারে। তাই খেলা ও পড়ার সাথি নির্বাচনে আমরা সচেতন হব ।

ধর্ম : ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের বিশ্বাস, যা নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিকে ন্যায় ও কল্যাণের প্রতি আহবান করা এবং অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখা। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, সহযোগিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী করে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলব এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলব।

গণমাধ্যম : জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমকে বলা হয় গণমাধ্যম। গণমাধ্যমসমূহ যেমন- সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য থাকে যা শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। বেতার নানা ধরনের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে। একই সাথে দেখা ও শোনার মাধ্যমে টেলিভিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য শিশুর সামাজিকীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্রও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি তা শুধু বিনোদনধর্মী না হয়ে আদর্শ ও বাস্তবধর্মী শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্র শিশুর মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ - ১ : শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথি ও পড়ার সাথির ভূমিকা চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৪ ও ৫ : শিশুশ্রমের ধারণা, কারণ ও প্রভাব

আমরা প্রায়ই লক্ষ করি অনেক শিশু মাদ্রাসায় না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। আবার অনেক শিশু মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম কাজ করে। তবে কোনো কোনো কাজ প্রায় প্রতিটি শিশুকে করতে হয় যা তার জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং তা তার ও তার পরিবারের

ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য সহায়ক। যেমন- মা-বাবার বা পরিবারের সদস্যদের কোনো কাজে সহায়তা করা। এসব কাজ করতে সে বাধ্য থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো কাজ আছে যা শিশুর জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের কাজকে শিশুশ্রম বলা হয়। সুতরাং উপার্জন করার জন্য কাজ করতে গিয়ে শিশুরা বিপদ, ঝুঁকি, শোষণ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হলে সে কাজকে শিশুশ্রম বলা হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রম বেআইনি।

আমাদের দেশের অনেক শিশু অন্যের বাসাবাড়িতে সহায়তাকারী হিসাবে কাজ করছে। বাসাবাড়ির বাইরেও বিভিন্ন কলকারখানায় যেমন-চুড়ি, বিড়ি, ব্যাটারি, জুতা তৈরির কাজ করছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানায়, লেদ ও ওয়েল্ডিং মেশিনেও কাজ করছে। গাড়ি বা টেম্পুর সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছে। বর্জ্য ঘেটে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে। কিন্তু কেন শিশুরা এসব কাজ করছে?

শিশুশ্রমের কারণ অনেক। অনেক অভিভাবক দরিদ্রতা বা পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। আবার মা-বাবা অসুস্থ হলে কিংবা তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে অনেক সময় শিশুরা অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয়। খুব কম মজুরিতে শিশুদের পাওয়া যায় বলে গৃহকর্মে বা ইটের ভাটার মতো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম ব্যবহার হয়। এছাড়া বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি অভিভাবকদের বৈষম্যমূলক আচরণও অনেক সময় মেয়ে শিশুকে শ্রমিকে পরিণত করে।

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অতিরিক্ত শ্রমের কারণে নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। একই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে যেতে দেখে, খেলতে দেখে এবং মা-বাবার সাথে বেড়াতে যেতে দেখে শিশু শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারাও এসব পেতে চায়। তাই চাহিদার অপূর্ণতা থেকে শিশু মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। শিশু স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। শিশু মনে এক প্রকার হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতার জন্ম নেয়। এসব শিশু আবেগহীন, ভয়হীন হয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। অপুষ্টি, অনিদ্রা, বিশ্রামহীন জীবন শিশু শ্রমিকের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। আমরা জীবনের জন্য ক্ষতিকর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখব এবং অন্যদেরকে বিরত থাকতে সহায়তা করব।

শিশুশ্রম : শিশু ইট ভাঙছে

কাজ : দলে ভাগ হয়ে ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও এগুলোর ক্ষতিকর দিক চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৬ : শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব

তোমাদের বয়সের অনেক ছেলে-মেয়ে বাসাবাড়িতে, কলকারখানায় কিংবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। অনেক সময় এসব শিশু যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না। স্নেহ, মায়া, মমতা কী এসব শিশু তা জানে না। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তাদের নিত্যসঙ্গী। ভেবে দেখো, ওরা যে কারণে আজ শ্রমজীবী হয়েছে যে কেউ আমরা এ অবস্থায় পড়তে পারি। এ কথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করলে তাদের প্রতি আমাদের মমতা হবে। কীভাবে তাদেরকে সহায়তা করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে।

তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে পারি। তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে পারি। বাসায় কোনো শিশু কাজ করলে তার কাজে সাহায্য করতে পারি। নিজের কিছু কাজ যেমন- ঘর, বিছানা, টেবিল গুছিয়ে রাখা, শুকনা কাপড় ভাঁজ করে রাখা ইত্যাদি নিজে করতে পারি। এতে শিশুটির উপর কাজের চাপ কমবে। কোনো সময়ে শিশুটি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা ও সেবাযত্ন করে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি। এতে সে বন্ধু হয়ে উঠবে। খেলাধুলায় তাকে সাথি করতে পারি। শিশুটিকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। এতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা হবে। ভেবে দেখো, এসব শিশুকে আমরা আর কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

ভালো পরিবেশে শিশুরা বেড়ে উঠলে পরিবার ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। এসব শিশুর প্রতি ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা নিজেরাও মানবিক গুণসম্পন্ন একজন নাগরিক হয়ে উঠব। আমরা পরিবারের অন্যান্যদেরও তাদের প্রতি ভালো আচরণ করার জন্য বলব।

কাজ : বাড়ির কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

পাঠ - ৭ : শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব

মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আদর-যত্ন ও ভালোবাসা শিশুকে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের দেশে পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং কলকারখানাসহ নানা ক্ষেত্রে সামান্য কারণে বা বিনা কারণে প্রায়শই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের প্রতি উপহাস, তিরস্কার, গালমন্দসহ শারীরিক ও মানসিক নানা অমানবিক ও নির্দয় আচরণ করা হয়। শিশুর প্রতি এরূপ বিরূপ আচরণ ও নির্যাতনকে শিশু নির্যাতন বলা হয়। এটি একটি গর্হিত কাজ।

শিশু নির্যাতন

অনেক পরিবারে মা-বাবার মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাঁটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব ঘটে। এসব কারণে মা-বাবার উভয়ের মনে সঞ্চিত রাগ, ক্ষোভ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঘরের সন্তান কিংবা বাড়ির কাজে সহায়তাকারী শিশুর উপর। তাছাড়া মা-বাবার বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ির মতো ঘটনার কারণেও শিশুরা নির্দয় আচরণের শিকার হয়। আবার শিশুরা কখনো কখনো বড় ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজন দ্বারা কারণে-অকারণে নির্যাতনের শিকার হতে পারে। কখনো কখনো শিশুরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুরা দুর্বল বলে প্রতিবেশীর সাথে জায়গা জমি নিয়ে বিরোধের কারণেও নির্যাতনের শিকার হয়। কারখানা বা হোটেল মালিক বা বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রমিক দ্বারা অনেক সময় শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক সময় বাস ড্রাইভার ও কন্ট্রাকটর দ্বারাও শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি এসব নির্যাতন তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

শিশুর প্রতি নির্দয় আচরণ শিশুর শারীরিক-মানসিক-নৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। অনেক সময় মা-বাবার অত্যধিক প্রত্যাশাও শিশুর উপর এক ধরনের মানসিক চাপ ও পীড়ন তৈরি করে যা শিশু মনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এতে শিশু ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ও খিটখিটে মেজাজের হয়।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে শিশুর প্রতি সচেতন আচরণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়তে হলে শিশু অধিকারের প্রতি সকলকে সচেতন হতে হবে। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের সরকারও কাজ করছে। নির্যাতনের শিকার শিশুদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। তবে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন জরুরি।

২০২০

কাজ : শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কী কী করতে পারো তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৮ ও ৯ : শিশুপাচার, কারণ ও প্রতিরোধ

আমরা মাঝেমাঝে খবরের কাগজ বা পোস্টারে কিংবা মাইকের ঘোষণা থেকে শিশু হারানো বিজ্ঞপ্তির কথা জানতে পারি। এসব শিশু কীভাবে হারায় কিংবা কোথায় যায় তা নিয়ে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। হারিয়ে যাওয়া শিশু অনেক সময় পাচার হয়ে যায়। শিশুপাচার মানবাধিকার বিরোধী কাজ।

শিশুপাচার হলো এক ধরনের অনৈতিক কাজ, যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিশুকে লোকচক্ষুর অগোচরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করে। এটি মানব পাচারের অন্তর্ভুক্ত।

নানা ধরনের কৌশলের মাধ্যমে শিশুপাচার হয়ে থাকে। যেমন- আদরের ছলে, লোভ দেখিয়ে, শিশু পছন্দ করে এমন বস্তু দেখিয়ে বা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শিশুকে পাচারকারী নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। কখনো কখনো ভয় দেখিয়ে, মিথ্যা বলে অথবা জোরপূর্বক শিশুকে অপহরণ করে পাচার করা হয়। আবার কখনো কখনো সমবয়সী বন্ধু ও সহপাঠীকে ব্যবহার করেও এ ধরনের কাজ করা হয়। পাচারকারী শিশুদেরকে মরুভূমিতে উটের জকিসহ বিভিন্ন অমানবিক কাজে ব্যবহার করা হয়। পাচারকারীরা কখনো কখনো শিশু দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে বিক্রি করে।

নানা কারণে শিশুপাচার হয়। দরিদ্র মা-বাবার সন্তান লালন-পালনে অক্ষমতা, মা-বাবা ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, চাকরির আশায় পাচারকারীদের হাতে তুলে দেওয়া, অভিভাবকহীন শিশুদের অসহায়ত্ব শিশু পাচারের অন্যতম কারণ।

শিশু পাচার হয়ে গেলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশু নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীসহ সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়াও বিদ্যালয়, মসজিদ, মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সতর্ক হতে হবে এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে।

শিশুপাচার প্রতিরোধে আমাদের করণীয় অনেক। পাচার প্রতিরোধে আমরা যা যা করতে পারি-

- দূরে কিংবা নির্জন স্থানে কখনো একাকী যাব না।
- অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া কোনো খাবার, খেলনা বা অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করব না।
- অপরিচিত বা সামান্য পরিচিত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো স্থানে যাব না।
- প্রলোভনকারী সম্পর্কে সতর্ক থাকব।
- পাচারকারীরা আমাদের আশপাশেই রয়েছে। তাই পাচারকারীর কৌশলগুলো সম্পর্কে আমরা নিজেরা যেমন সতর্ক হব এবং অন্যদেরকেও এ বিষয়ে সতর্ক করব।
- প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাব।

শিশু পাচারের জন্য প্রলোভন দেখানো হচ্ছে

কাজ - ১ : শিশুপাচার প্রতিরোধে এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে তোমরা কী কী করতে পারো তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ - ২ : দলে ভাগ হয়ে শিশুপাচার বিরোধী কয়েকটি শ্লোগান তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় কোনটি থেকে?

ক. খেলার সাথি গ. প্রতিবেশী

খ. পরিবার ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২. শিশুশ্রমের কারণ-

i. শিশুদের অবাধ্যতা

ii. পারিবারিক আর্থিক সংকট

iii. পারিবারিক অশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়ে শুভ পথ হারিয়ে ফেলে। পথ চিনিয়ে দেওয়ার কথা বলে এক লোক তাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কিছু অপরিচিত লোকের হাতে তুলে দেয়। শুভকে হারিয়ে ছোট ছেলে সামীকে বাবা-মা লেখাপড়া, গান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য করে তোলার জন্য অতিরিক্ত চাপ দেন।

৩. শুভ কোন সমস্যার শিকার?

ক. শিশুশ্রম গ. শিশু নির্যাতন
খ. শিশুপাচার ঘ. শিশু অপহরণ

৪. সামীর ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে তা হলো-

i. সে অত্যধিক মেধাবী হবে
ii. তার খাওয়ায় অরুচি হবে
iii. কাজে অনীহা দেখা দেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii
খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তেরো বছর বয়সী মোহন জুতার কারখানায় কাজ করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে করতে মাঝেমাঝে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পনেরো বছরের মলি এক বাসায় কাজ করে। সেখানে তাকে ভালো খাবার খেতে দেয়, বেড়াতে নিয়ে যায়, ঈদের সময় তার পছন্দের পোশাক কিনে দেয়। কাজের অবসরে তাকে পড়ার সুযোগও দেয়।

ক. ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য কোন কাজ শিশুদের উপযোগী?
খ. প্রতিবন্ধকতা শিশুর জীবনে কী প্রভাব ফেলে ব্যাখ্যা কর।
গ. মোহনের কাজ কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মলির কর্মক্ষেত্রে তার প্রতি আচরণ মূল্যায়ন কর।

২. মায়ের উদ্যোগে মিলি তার বন্ধুদের নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করে। কেউ বিপদে পড়লে এই ক্লাবের সকলে মিলে সাহায্য করে। অন্যদিকে মিলির ভাই ও তার বন্ধুরা মিলে একটি সংগঠন করে যেখানে তারা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়ে। জীবনধর্মী বিভিন্ন ছবি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখে।

ক. সামাজিকীকরণ কী?
খ. ব্যক্তির সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।
গ. মিলি সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমকে ফুটিয়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মিলির ভাই ও তার বন্ধুদের কর্মকাণ্ড তাদের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে কি তুমি মনে কর? মতামত দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

বর্তমানে আধুনিকযুগে কোনো রাষ্ট্রই এককভাবে তাদের প্রয়োজন সম্পন্ন করতে পারে না। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সহযোগিতা সংস্থা। এদের মধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘ। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ গঠন করা হয়। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। যেমন- সার্ক, আসিয়ান, ইইউ প্রভৃতি। এসব সংস্থা তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করে। আমরা পঞ্চম শ্রেণিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা ও সার্ক সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একই অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারব;
- বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার গঠন এবং কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ - ১ ও ২ : আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ও এর ক্ষেত্র

আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যা ও প্রয়োজন বিভিন্ন রকম। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই এককভাবে তার সকল প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। অথচ এ সমস্ত প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধান না হলে কোনো রাষ্ট্রের জনগণেরই কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যদি পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়। তাই একই অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সহযোগিতা করে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে উঠে। তারা যৌথ উদ্যোগে এসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাধাসমূহ দূর করার জন্য কাজ করে। ফলে সকল পক্ষের উন্নয়ন সাধন হয়।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র

আঞ্চলিক সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ক্ষেত্রসমূহ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে- শিল্প-বাণিজ্য, নিরাপত্তা, জ্বালানি, তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, পর্যটন, ক্রীড়া, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবহন ও যোগাযোগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিনিময়, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, জলবায়ু ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি।

২০২০

কাজ : আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৩ ও ৪ : উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাসমূহ

অবস্থানগত সুবিধার ভিত্তিতে পৃথিবীতে অনেক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে উঠেছে। আমরা এ পাঠে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানব।

সার্ক (SAARC)

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে গঠন করেছে সার্ক। সংস্থাটির পুরো নাম-South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)।

বাংলায় বলা যায়-দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়া সার্কের অন্যান্য সদস্য দেশগুলো হলো-ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান ও আফগানিস্তান। এছাড়া বর্তমানে মিয়ানমার পর্যবেক্ষক হিসাবে এ সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা হলেও এর কর্মক্ষেত্র সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য।
- কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা।
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা।
- উক্ত অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা।

আসিয়ান (ASEAN)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশ নিয়ে ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট গঠিত হয় আসিয়ান। সংস্থাটির পুরো নাম-Association of South-East Asian Nations (ASEAN)। বাংলায় বলা হয়-দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা। এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, লাওস, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর। আসিয়ানের সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়।

আসিয়ান গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সম্মিলিত উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।
- উক্ত অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সৌহার্দ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করা।
- পেশাগত ও কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা ইত্যাদি।

কাজ - ১ : এশিয়ার মানচিত্রে আসিয়ান ও সার্কভুক্ত দেশগুলো দেখাও।
কাজ - ২ : সার্ক কোন কোন কাজগুলো করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ৩ : আসিয়ান কোন কোন কাজগুলো করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রথমে গঠন করেছিল কমন মার্কেট। তারপর এর আওতা বেড়ে হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)। ইউরোপের প্রায় সব দেশই এর সদস্য। ইইউ তার নিজস্ব মুদ্রাও চালু করেছে, যার নাম 'ইউরো'। ইউরোপের সব দেশেই তাদের দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি এই ইউরোও চলে। সদস্য দেশগুলোর নাগরিকেরা অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত, বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্-এ অবস্থিত।

ইইউ ছাড়াও পৃথিবীতে এরূপ আরও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা রয়েছে। যেমন- শিল্পোন্নত শীর্ষ সাত দেশের জোট 'জি-৭'। সাত সদস্যের এই সংস্থায় আছে-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা ও ইতালি। এই গ্রুপ কেবল নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাই করে না। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। তাছাড়া পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অভিশাপমুক্ত পৃথিবী গড়ার বিষয়ে তাদের করণীয় নিয়েও আলোচনা ও নিজস্ব কর্মকৌশল নির্ধারণ করে জি-৭।

আফ্রিকার দেশগুলো মিলে গড়ে তুলেছে ওএইউ বা Organization of African Unity (OAU); আরব দেশগুলোর সংগঠন আরবলীগ; মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি বা Organization of Islamic Cooperation (OIC)। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ; আবার কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় এমন দেশগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা Non-Aligned Movement (NAM)। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

এছাড়া দুইটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন হয়। বর্তমানে এ ধরনের চুক্তি বেড়েই চলেছে। কারণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো এই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি।

কাজ : আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ কীভাবে উপকৃত হয় তা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্কের মূল লক্ষ্য কী?

ক. সামাজিক সহযোগিতা   গ. সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

খ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা   ঘ. শিক্ষা সহযোগিতা

২. ইইউ'র নিজস্ব মুদ্রার নাম কী?

ক. ডলার   গ. ইউরো

খ. পাউন্ড   ঘ. রুপি

২০২০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের আরও পাঁচটি দেশ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে পরিবেশ রক্ষাসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

৩. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে?

ক. ইইউ
গ. জি-সেভেন
খ. ওএইউ
ঘ. এনএএম

৪. উল্লিখিত সংস্থাটি কাজ করছে-

i. নিজেদের জন্য
ii. স্বল্পোন্নত দেশের জন্য
iii. দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়তে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. i ও iii
খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাহাতের নেপালি বন্ধু গোমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাহাত বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে নেপালের শিল্পকলা একাডেমিতে গান পরিবেশন করেন। রাহাত নেপালে অবস্থান কালে গোমেজের বাড়িতে বেড়াতে যান।

ক. আসিয়ানের পূর্ণরূপ কী?
খ. দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. নেপালে গিয়ে রাহাতের গান পরিবেশন করা সার্কের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত কাজটি ছাড়াও সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে কাজ করে- বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে জাতিসংঘ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, ব্যাধি, পরিবেশ বিপর্যয়মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) ঘোষণা করে। ২০১৫ সালে এমডিজির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জাতিসংঘ ২০৩০ সালকে সীমারেখা ধরে ঘোষণা করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যা ইংরেজিতে Sustainable Development Goals (এসডিজি) নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা টেকসই উন্নয়নের ধারণা ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- টেকসই উন্নয়ন-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বর্ণনা করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির চিত্রভিত্তিক পোস্টার তৈরি করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আগ্রহী হব।

পাঠ-১: টেকসই উন্নয়ন

পৃথিবী নামক গ্রহে আমাদের বাস। পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ যেমন-অক্সিজেন, খাদ্য, জ্বালানি, পানি, মাটি, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি। শুধু তা-ই নয়, গাছের ছায়া ও মনোরম আবহাওয়াও আমরা উপভোগ করি। লক্ষ করলে দেখবে, আমাদের পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পাল্টে যাচ্ছে। এর পিছনে কারণ কী? পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের চাহিদা; বাড়ছে ভোগ বিলাসের পরিমাণ। চাহিদা ও ভোগ বিলাস মেটাতে মানুষ নিজেদের উন্নতি ও আয় বৃদ্ধির কথা ভাবছে, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজ করছে। যেমন, মানুষ নির্মাণ করছে নতুন নতুন বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিল্পকারখানা, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো

ইত্যাদি। কৃষক ফসলি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াচ্ছে। কিন্তু অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যেরও ক্ষতি হচ্ছে। এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই নয়।

টেকসই উন্নয়ন এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যা ভবিষ্যতের কথা ভেবে করা হয়। ফলে প্রকৃতিকে ঠিক রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন যেমন একদিকে মানুষের বর্তমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন, ফসলি জমির জন্য ক্ষতিকর কোনো কীটনাশক ব্যবহার না করে উৎপাদন বাড়ানো। পরিবেশবান্ধব কৃষি কার্যক্রম বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখতেও সাহায্য করে। মানুষ ও প্রাণিসম্পদের নিরাপত্তাবিধান সম্ভব হয়। আমরা টেকসই উন্নয়নের এমন অনেক উদাহরণ দিতে পারি।

টেকসই উন্নয়ন শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, বরং তা সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নেরও আওতাভুক্ত। যেমন, মানসম্মত শিক্ষাগ্রহণ করে দারিদ্র্য ঘোচানো। নারী-পুরুষ একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা।

সুতরাং আমরা সবাই টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করব।

কাজ-১: তোমার পাঠ থেকে টেকসই উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।
কাজ-২: টেকসই উন্নয়নের ৫টি উদাহরণ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

পাঠ-২: জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা লক্ষ্য (এসডিজি)

জাতিসংঘ বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের আয়োজনে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহস্রাব্দ উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করে ২০১৫ সালের মধ্যে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়। লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এনে নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যু হার কমানো, মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals- এমডিজি) অর্জনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষণা করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Sustainable Development Goals (এসডিজি)। এসডিজির মাধ্যমে পৃথিবীতে সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই সহযোগিতার জন্য ১৭টি সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে বিশ্ব পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে এসডিজি অর্জনের কাজ শুরু হয়েছে যা শেষ হবে ২০৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বৃত্তলেখ চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করি-

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হলো- ১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ২. ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ৩. সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ৪. সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি ৫. জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ৬. সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ৭. সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ৮. সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ৯. অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ ১০. অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ১৫. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা,

২০২০

মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমি অবক্ষয় রোধ, ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ১৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

বাংলাদেশ ২০১৫ সালে শেষ হওয়া এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কাজ : এসডিজিভিত্তিক সচেতনতামূলক পোস্টার পেপার তৈরি কর এবং সকলে মিলে র‍্যালির আয়োজন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে?

ক. ৮ খ. ১৫
গ. ১৭ ঘ. ২৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

মোর্শেদ সাহেব তাঁর কাপড় তৈরির কারখানায় বৈদ্যুতিক পাখা, এসি ইত্যাদির পরিবর্তে কারখানার সাত তলা ভবন সবুজ লতাগুল্মে ঢেকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া ছাদের উপরে কম খরচে সোলার প্যানেল বসিয়ে মেশিন চালানোর জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও এলাকায় প্রশিক্ষণবিহীন বেকার লোকজনকে শ্রমিক হিসেবে চাকরি দিয়ে এলাকায় বেশ জনপ্রিয়।

২. মোর্শেদ সাহেবের কারখানাটি কী ধরনের?

ক. হস্তশিল্প খ. পরিবেশবান্ধব
গ. আধুনিক প্রযুক্তিবান্ধব ঘ. অধিক উৎপাদনশীল

৩. মোর্শেদ সাহেবের কারখানাটি -

i. পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করছে

ii. জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করছে

iii. নবায়নযোগ্য জ্বালানির সঠিক ব্যবহার করছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তানিয়াদের স্কুলে একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। তাদের স্কুলের সবাই এখন নলকূপের বিশুদ্ধ পানি পান করে। স্কুলের ক্যান্টিনে তৈরি পুষ্টিকর খাবার দিয়ে তারা টিফিন করে। স্কুলের তৈরি পাকা পায়খানা ব্যবহারে সবাই অভ্যস্থ। বারান্দায় রাখা ডাস্টবিনে তারা সব ধরনের আবর্জনা ফেলে। তাদের ক্লাসরুম এবং স্কুলের সব জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এতে স্কুলে অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতি যেমন কমেছে, তেমনি শিক্ষার প্রতি সবার আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক. আমরা কোথা থেকে জীবনধারণের সকল উপকরণ পাই?

খ. আমাদের পৃথিবী কেন পাল্টে যাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. তানিয়াদের স্কুল টেকসই উন্নয়নের কোন অভীষ্ট অর্জনে কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্কুল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে-মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২০

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৬ষ্ঠ-বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য